সে কি এলো ফিরে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

জ্যোতি প্রকাশন

২এ, নবীন কুণ্ডু লেন,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপাল চন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭।এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

কর্মবীর

শ্রীবীরেন সিমলাই

প্রিয়বরেষু

হিজলবনের ধারে।

আগের সেই ঝোপঝাড় তেমনিই আছে। তেমনি ভয়াবহ জায়গা। এ-ধার দিয়ে বড় একটা কেউ যাতায়াত করে না। দিনের বেলাতেই ভয় ধরে।

আমায় জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এসেছে বজ্রকান্তদের বংশের জোয়ান ছেলেটি। নিশিকান্ত। নিশিকান্ত বলছে, সুরমাদেবীর বারণ সত্ত্বেও এখান দিয়েই যেত এককালের শিবশঙ্কর—বিনয়কৃষ্ণ।

এখানে আসার জন্য নিদারুণ আকর্ষণ অনুভব করেছে বজ্রকান্ত। বিনয়কৃষ্ণর অতি স্নেহের ঘোড়াটাও আসতে চাইত কেবল এই পথে।

সুরমাও ঘোড়ায় চেপে এসে পড়েছিল একদিন নিজের অগোচরেই···।

জায়গাটা দেখে ফিরে এলুম সুরমার বাড়ির রাস্তায়।

বাড়ির দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিশিকান্ত। ওর পাশে আমি। আমারও ছু'পা যেন হঠাৎ আটকে গেছে মাটির সঙ্গে···

দরজাগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল বজ্রকান্ত।

বাড়িটা নির্বান্ধবপুরী মনে হচ্ছে। লোকজন নেই কেউ। কিন্তু বজ্রকান্ত জানে বাড়ি-ভর্তি লোক। অথচ নিস্তব্ধ নিঝুম। এটা তার ভালো লাগছে না। এ বাড়ির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। আসা-যাওয়া আজ অবধি বন্ধ হয়নি একদিনের জন্য, অবিশ্যি অসুখ-বিসুখে ব্যতিক্রম হয়েছে।

আজ সবকিছু নতুন ঠেকছে। বাড়িটাও। বজ্রকান্ত প্রবেশ করল ভেতরে। ভরসন্ধ্যের ভেতরে মাঝরাত। গোটা বাড়িটা ঘুমিয়ে আছে। সিঁড়ির ধাপে পা রাখল, ওপরে উঠবে। মনে হল, কে যেন পেছনে এসে দাঁড়াল তার। শুধু পেছনেই ঘাড় ফেরাল না বজ্রকান্ত, ডানপাশ বাঁপাশ সামনে—বড় বড় চোখ করে দেখল। কেউ কোথাও নেই। একটা বেরাল-কুকুর পর্যন্ত চোখে পড়ল না।

ধাপে ধাপে পা ফেলে ওপরে উঠছে। কেবলি মনে হচ্ছে, কেউ না কেউ অনুসরণ করছে তাকে। এমন অনুভূতি এর আগে এ বাড়িতে হয়নি কখনো তার। দোতলার বারান্দায় আসতেই কার যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনল কানে। একটু দাঁড়িয়ে পড়েই, আবার এগোতে লাগল।

বারান্দার শেষের ঘরটার দরজা হু'হাট করে খোলা। প্রদীপ জ্বলছে। আলোটা থর থর করে কাঁপছে হাওয়ায়। ঘরে লোক আছে নিশ্চয়। অন্য কাউকে দরকার নেই। যাকে দরকার—যার জন্য আসা—সারাটা পথ যার মুখ ভেসে উঠেছে—সে থাকলেই হল। সুরমা।

বজ্রকান্তের ধ্যান-জ্ঞান সুরমা। সুরমার আকর্ষণেই বরাবরই

আসে। এখনো এসেছে। পনেরো থেকে পঁচিশ অবধি সুরমার মুখ তার বুকের তলায় লুকনো রয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সুরমাকে। কুচকুচে কালো চুল খাটের ওপর থেকে লুটোচ্ছে মেঝেয়। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। না হলে বেরিয়ে আসত ঘর থেকে তাকে দেখে। হাসতে হাসতে বলত, ও বাড়ির কেউই তো আর আসে না। আমাদের ওপর টান যা তোমারই। এসো এসো—ঘরে এসো!

আরাম কেদারায় বসতে বলে, চুমকিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে বাড়ি মাত করত।—নতুন যে কাঁচাগোল্লা আর রাঘবশাহী সন্দেশ এসেছে, ছোটবাবুর জন্য নিয়ে আয় শিগগির। ছোটবাবু যা পরিষ্কার—রেকাবিটা ধুয়ে, ফর্সা কাপড়ে মুছে নিবি।

বজ্রকান্ত এগোচ্ছে পায়ে পায়ে। সুরমা একাই রয়েছে ঘরে। কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বজ্রকান্ত নিশ্চিন্ত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যখুনি এসেছে, কাছে লোক আর লোক। দু'দণ্ড একা পাওয়ার জো নেই। দুটো কথা কইবে যে একান্তে, তাতেও লোকের দৃষ্টি, লোকের কথা!

আজকের মত সুযোগ কোনদিন পায় নি। আনন্দে দু'চোখের পাতা বুজে আসছে। বারান্দার থাম ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। একটা ছেলেমানুষি পেয়ে বসেছে। শিকেয় ঝোলানো ছাতার কাপড় ঢাকা ময়নার খাঁচাটাকে নিচে—উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। ময়নাটা ভয় পেয়ে চিৎকার করবে, খাঁচার ভেতর দাপাদাপি করবে।

আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার দড়ি খুলে দিতে ইচ্ছে করছে। কষে চাবুক লাগাবে ঘোড়ার পিঠে। চিঁ-হিঁ-হিঁ করে চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটবে ঘোড়াটা।

ময়না আর ঘোড়া—এরা দুটোতেই বুঝে ফেলেছে হয়তো বজ্রকান্তর মনোভাব। তা নাহলে বারমহল থেকে ঘোড়াটা চিৎকার করে উঠল কেন অমন করে? মনের ইচ্ছে কি বাতাসে ভেসে

বেড়ায় ? এখান থেকে চলে গেছে ওর মনে। ময়নার খাঁচাটাও বেশ দুলছে। ভেতরে ছটফট করছে ময়না। বজ্রকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেল।

তাকাল সুরমার দিকে। ঘুমে অচেতন।

বজ্রকান্ত এসে পড়েছে ঘরের দোরে। চৌকাঠের ওপারে ঘরের ভেতর পা রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুরমার জায়গায় বিনয়কৃষ্ণ শুয়ে। দ্রুতপায়ে সরে এলো।

এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দিল না তাকে কে যেন। পিঠে ধাক্কা মেরে মেরে সিঁড়ির মুখে নিয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাতে দিল না একবারের জন্য। সিঁড়ি থেকে ঠেলে ঠেলে নামিয়ে দিল। সদরের বাইরে সে বুঝি বার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছোটার মত করেই চলেছে বজ্রকান্ত। তাকে ছোটাচ্ছে কেউ। বুঝতে পারছে, কিন্তু করার কোন হাত নেই তার। এক অদৃশ্য হাতের ওপর ভেসে চলেছে যেন।

হাঁপিয়ে পড়ছে বজ্রকান্ত। ঘেমে নেয়ে উঠছে। পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায় চৈত্রের দুপুর রোদের তাপ পাচ্ছে সারা দেহে। বুড়ো আঙুলে কপালের ঘাম মুছে ফেলছে। আঙুল থেকে রক্তের ফোঁটা পড়ছে বুঝি টপ টপ করে। নিচের দিকে তাকাল। হাঁ ক'রে ফাটা জমিটা গিলছে তার রক্তের ফোঁটা। কি ভয়ঙ্কর!

ন্যাড়া বাবলা গাছ যেন এক একটা দত্যিদানা দাঁড়িয়ে। কাটা ধানগাছের গোড়ায় এক একটা মানুষের মুণ্ডু। হাসছে, ব্যঙ্গ করছে বজ্রকান্তকে।—যে সুরমার মুখ তোমায় পাগল করে রেখেছে দিন-রাত—তার কাছে যেতে গিয়ে অত ভয় পেলে কেন ? কেন, কেন ?

বজ্রকান্তর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। করাত দিয়ে কে চিরছে। চলনবিলের দিকে দৃষ্টি গেল। বর্ষার বিশাল চেহারা হারিয়ে ফেলেছে গ্রীষ্মে। কোথাও ধানজমি, কোথাও অল্পস্বল্প জল। অল্প জলে যেন রক্তের ঢেউ উঠছে। বিরাট ঢেউ। তরতাজা

জওয়ানের খুন উপচে-উপচে পড়ছে। ছুটে আসছে এই দিকে। বজ্রকান্তকে ডুবিয়ে মারবে।

দু'চোখ বুজে ফেলল বজ্রকান্ত। তাকাতে পারছে না আর। কি বিভীষিকা। পা দুটো চলতে চাইছে না। প্রাণপণে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখুনি বাড়ি পৌঁছুতে না পারলে, জীবনে আর পৌঁছুতে পারবে না সে।

বজ্রকান্ত বাড়িতে এলো কোনরকমে। অতিরিক্ত ক্লান্ত। সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে ওপরে উঠল। ঘরে এসে, আছড়ে পড়ল বিছানায়। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। দরজার দিকে নজর পড়তেই বিনয়কৃষ্ণকে দেখে, চিৎকার করে উঠল।—বেরিয়ে যাও। চোখের সামনে থেকে শিগগির বেরিয়ে যাও!

ছুটে এল রাধামণি। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি বলছ তুমি? আমি যে—আমি, আমি।

—কে—সুরমা?

—না, রাধা।

বেহুঁশ হয়ে পড়ল বজ্রকান্ত।

রাধামণির দু'চোখে জল। মাসখানেক হল লোকটা কেমন হয়ে গেছে। প্রায় রাতেই এই চিৎকার। জিজ্ঞেস করলে কিচ্ছু বলে না। চুপ করে থাকে। সুরমার ব্যাপার সবই জানে রাধামণি। সুরমাকে বজ্রকান্ত ভুলতে পারবে না কখনো। ছোটবেলা থেকেই সুরমা-সুরমা করে পাগল।

সুরমাকে বহুবার দেখেছে রাধামণি। এখনো দেখে রোজ রাত্তিরে। মরা জ্যোৎস্নায়, ফিনকি ফোটা আলোয় ফিকে অন্ধকারে আর অমাবস্যার পাথর-জমাট আঁধারে। এক এক সময় এক এক মূর্তি।

মূর্তির রকমফের থাকলেও রূপের জলুস কমে না এতটুকু। পৃথিবীর সমস্ত রূপসীর রূপ একসঙ্গে জড়ো হয়েছে সারা দেহ জুড়ে। হিংসে হয়। তবুও সব মেয়েরই দৃষ্টি ডুবে যায় ওই রূপের দরিয়ায়। মেয়েদের যখন এই অবস্থা, ছেলেদের পাগল হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

বজ্রকান্ত পাগল রাধামণির বিয়ের আগে থেকেই। পাগলামিটা বেড়েছে আরো বিয়ের পর। রাধামণির ভেতরের জ্বলুনিটা তাই সময়-সময় এত জ্বালিয়েছে যে, নিজের কাছে নিজেকেই অদ্ভুত মনে হয়েছে। একদম ক্ষ্যাপা মানুষ। দিনেরাতে ঘুম থাকেনি চোখে। খাওয়ায় অরুচি। গায়ে জল ছোঁয়াতে আতঙ্ক। দু'চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছে বজ্রকান্ত। আর সুরমা? সুরমা তো আস্ত একটা শয়তানী। স্বামীটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। সুরমা বেঁচে থাকতে রাধামণি সুখী হতে পারবে না। তার স্বামী তার হবে না কখনো।

খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করেছে সুরমাকে। একগাদা ছাইয়ের ওপর রেখে গলায় হেঁসোর কোপ। মাটিতে একফোঁটা রক্ত ঝরে না পড়তে পারে যেন। কে বলতে পারে ওর একফোঁটা রক্তে আর একটা দ্বিতীয় সুরমা জন্মাবে না? খাটের বাজু ধরে রাধামণি পা রাখল মেঝেয়। জানলায় এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার পায়ের খুরের

খট-খট শব্দ কানে বাজছে। রাধামণি জানে কার ঘোড়া, কে. আসছে। সুরমা আসছে ঘোড়ায় চেপে।

স্পষ্ট দেখছে রাধামণি; পেছনে বিনয়কৃষ্ণ বসে। বিষণ্নমুখ। বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল সুরমা ঘোড়ার লাগাম টানা-ছাড়া করতে করতে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিক পরে এই রাস্তা দিয়েই ফিরবে আবার—একই ভাবে। যাওয়া-আসার একই ভাব হলেও, মনেব পরিবর্তন প্রতিদিন চোখে পড়ে। কোনদিন আনমনা, কোনদিন উদাসী। কোনদিন অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কি একটা খুঁজে বেড়ায়। হয়তো ও সেটা জানে, হয়তো জানেই না। নিজের অগোচরে খোঁজাখুঁজি করে মরে।

ঘোড়া থেকে নামে। সেদিন কিন্তু ওব পাশে বা ঘোড়ার পিঠে দেখা যায় না বিনয়কৃষ্ণকে, ঘোড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন কি বলে ফিস-ফিস করে। ঘোড়াটা কি বোঝে কে জানে। সামনের পা দু'টো দিয়ে ঠোক্কর মেরে মেরে মাটি খুঁড়তে থাকে। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে মাথা দোলাতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে।

ঘোড়ার পিঠে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সারা হয় সুরমা নির্জন মেঠোপথে। এ ব্যাপার কেউ দেখে নি। বজ্রকান্ত দেখে থাকলেও থাকতে পারে। অনেকদিন রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে দৌড়ে। তখুনি ফিরে এসেছে আবার। ভয়ে মুখের রক্ত সরে গেছে। ধবধবে সাদা কাগজ একখানা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, রাধা!' দুঃখীরামকে টানাপাখার দড়িটা একটু টানতে বল না! হাওয়া কি কোথাও নেই নাকি? নিশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। যমযাতনা সহ্য করতে পারছি না আর। রাস্তার দিকের জানলাটা খোলা রেখেছ কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাঁ করে দেখছ কি? বজ্রকান্তর কষ্ট রাধামণির পুরনো ক্ষতের ওপর একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। একটা নির্দয় আনন্দ নাচানাচি করে বেড়ায় রক্তে। জানলা বন্ধ করে। সুরমাকে দেখতে চাইছে না আর। ওর দিক থেকে মন সরিয়ে

আনতে চাইছে হয়তো। হয়তো সেই আচারীবাবার কথা ফলতে চলেছে হাতে হাতে।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় রাধামণি। মনে মনে আচারীবাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

আচারীবাবা এসেছিল এই হিজলগাঁয়ের শ্মশানে। দর্শনের জন্য আর আশীর্বাদ নেয়ার জন্য শ্মশানে মড়া পোড়ানো দায় হয়ে দাঁড়াল। লোকে লোকারণ্য। ঠেলাঠেলির চোটে কত জলজ্যান্ত মানুষ জ্বলন্ত চিতায় পড়ে পুড়ে মরল।

গ্রামের মাথাদের টনক নড়ল। আচারীবাবার সঙ্গে যখন-তখন দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। তাদের হুকুম না নিয়ে কেউ যেতে পারবে না ওখানে। পাইক-বরকন্দাজের পাহারা পড়ে গেল শ্মশানের চতুর্দিকে।

বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল সাধুর গুণমাহাত্ম্য। আচারীবাবা বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। মুখে যা বলে অব্যর্থ ফলে যায়। ওর কৃপাদৃষ্টিতে মনস্কামনা পূর্ণ হতে এতটুকু দেরী হয় না।

শাশুড়ী মহেশ্বরীকে ধরে পড়ল রাধামণি। শ্বশুর শুদ্ধকান্ত মাথাদের মধ্যে একজন। মা যেন বাবাকে বলে-কয়ে সাধুর সঙ্গে দেখা করার দিন স্থির করে দেয় একটা।

মহেশ্বরী রাধামণির আরজি শুনে মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, রাস্তা দিয়ে যাবে কেমন করে?

অবাক হয়ে গেল রাধামণি। বড়তরফের কুলের বৌ সুরমা ঘোড়ায় চেপে বেড়িয়ে বেড়ায়। প্রজাদের অসুখ-বিসুখে দেখতে যায়, ওষুধ দিতে যায়। কই, কেউ তো বাধা দেয় না। কেন—ভাসুর সুরমার অনুগত বলে? তার পোড়া বরাত সকলে জানে। স্বামীর মনে ঠাঁই নেই। তাই কি অজুহাতের বেড়া? সে যাচ্ছে কেন—এটা বুঝল না শাশুড়ী। ওরই ছেলেকে ঘরবাসী করে রাখার জন্য। সুরমার কাছ থেকে মনটাকে ছিনিয়ে আনার

জন্য। নিজের ঘরের লোকই যদি বৈরী হয়, তাহলে তো রাধামণির অবস্থা—ঘরে থেকে পরবাসী, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

বৌয়ের মুখ দেখে, মনোভাব আঁচ করেছে কিছুটা শাশুড়ী। কি বলতে যাচ্ছিল, বারান্দায় খড়মের আওয়াজ। কর্তা আসছে। গলা খেঁকরানিও শোনা যাচ্ছে বার বার।

মহেশ্বরী চৌকাঠের ওপারে পেছিয়ে গেল একটু। নথের সোনার টানাটা চুলে চেপে দিল ভালো ক'রে। একগলা ঘোমটা টেনে একটু জোর গলায়—কর্তার কর্ণগোচর হয় যাতে—বলল, ওঁকে তোমার ইচ্ছার কথা জানাব। তোমার ওপর আমাদের সকলের মমতা আছে জেনো। বজ্রর জন্য আমারও কি মনে শান্তি আছে, না কর্তার আছে?

পরের দিন খাবার ঘরে বসে, রুইমাছের চোখ খেতে খেতে হেসে ফেলল শাশুড়ী। বলল, বৌমা, তোমার ঠাকুর সিন্নী খেয়েছে গো। কর্তা রাজী। বাড়ি থেকে শ্মশান অবধি দু'দিকে কাপড়ের পরদায় ঘিরে দেয়া হবে। পরদা ঘেরা গরুর গাড়ি করে শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া হবে তোমাকে। দ্যাখো কি হয়। এখন তো আমাদের ভাগ্যে নয় ও। তোমার ভাগ্যের ওপরই নির্ভর করছে সমস্ত। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে কম সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করেছি বজ্রর জন্য? কারো তো দয়া হল না।

বংশের কুলজ্যোতিষী দিনক্ষণ দেখে দিল পাঁজিপুঁথি দেখে, অনেক আঁক কষাকষি করে দিনক্ষণ স্থির হল। মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

তখন ভোরের আলো ফুটেছে সবে। ফাগুনের হাওয়ায় কোকিলের মিষ্টি ডাক শোনা যাচ্ছে। একা কোকিলের নয়, আরো অন্য-অন্য পাখীরাও গান গাইছে গাছের ডালে বসে। লালচে-সবুজ নধর পাতা ঠোকরাচ্ছে লাল-কালো ঠোঁট দিয়ে।

এদিকটায় লোকজন কেউ আসবে না—আগে থাকতে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। রাধামণি একা চলছে না। বড়ঘরের মেয়ে বড়ঘরের বউ। পুরোনো ঝি ফুলমালাকে সঙ্গে দিয়েছে শাশুড়ী।

রাধামণির পরনে লালপাড় দুধে-গরদের শাড়ী। হাতে চুড়ি-বালা-তাগা। গলায় সাতনরী সোনার গোট হার। কানে কানবালা। নাকে নাকছাবি। পায়ে তোড়া, লাল টকটকে আলতা পরা। ফুল আর ফলে ভরা পেতলের সাজিটা ফুলমালার হাতে।

চলতে চলতে একটা অজানা আনন্দে ভরে উঠছে রাধামণির ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কাও আসছে আবার। সাধুর দয়া পাবে বলেই তো আশায় বুক বেঁধে যাচ্ছি, যদি দয়া না হয়!

যাক্ গে, ওসব অশুভ চিন্তা না করাই ভালো শুভ কাজের আশায় বেরিয়ে। দয়া নিশ্চয়ই পাবো। ওরা অন্তর্যামী। মনের ব্যথা তো বুঝতেই পারবে। সাধুর কাছে এলো শ্মশানে।

সামনে একটা চিতা জ্বলছে। মড়ার খুলিতে করে মড়ার মাথার ঘি নিয়ে চিতায় আহুতি দিচ্ছে সাধু। চিতা হোম করছে।

মাটিতে একটা বাঘছাল বিছানো। আচারীবাবা তার ওপর বসে। মাথায় বাঘলোম রঙের জটা। মুখে দাঁড়িগোঁফ ভর্তি। কোমরে লাল কৌপিন।

ফলফুলের সাজিটা ফুলমালার হাত থেকে নিয়ে আচারীবাবার পায়ের কাছে রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল রাধামণি। সেদিকে লক্ষ্য নেই সাধুর। হোম করেই যাচ্ছে। বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করছে, রাধামণি একবর্ণও বুঝতে পারছে না।

প্রণামের আশীর্বাদ জানাল না সাধু। রাধামণি দুরু দুরু বুকে বসে বসে আহুতি দেওয়া দেখছে আর মনে মনে প্রার্থনা করছে, সাধুর দয়া হয় যেন তার ওপর। আশীর্বাদ পায় যেন।

হোম শেষে ফিরে তাকাল সাধু। গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক সময়েই এসে পড়েছিস। কথা শুনে ধড়ে প্রাণ এলো রাধামণির। আশ্বস্ত হল। বলল, সবই বাবার দয়া।

ছাগল বলির রক্তটা একটা কালো পাথরবাটিতে জমে গেছে একদম। কালচে হয়ে গেছে। কলাপাতার ওপর ভোগের জন্য আধপোড়া মড়ার মাংস—তিন টুকরো পড়ে রয়েছে। এক একটা

টুকরো চাপ রক্তে ডুবিয়ে মড়ার খুলির কারণে ডোবাল সাধু। মুখে পুরে কচমচ ক'রে চিবোতে লাগল। তিনটে টুকরোই এইভাবে মুখে পুরল পর পর।

রাধামণির গা ঘিন ঘিন করছে। বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না মোটে। যে কাজের জন্য এসেছে, এর দ্বারা হবে কিনা কে জানে। দেখেশুনে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম। পালাতে পারলে বাঁচে।

রাধামণি চঞ্চল হয়ে উঠছে। সাধুর চোখ এড়ায়নি। বলল, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এমনি এমনি? একটু চুপচাপ বসে থাকতে পারছিস না? আমি এত কষ্ট করে মরছি কার জন্য? তোর শ্বশুরের মুখে শুনেছি সব। বলে, মড়ার খুলির বাকি কারণবারিটুকু ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল।

—শোন্, সুরমার ছবি একখানা যোগাড় করে দিতে পারিস? দেখি, কেমন করে ও বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়ায় আর বজ্রকান্ত। আচ্ছা, ওই সর্বনাশীকে দুনিয়া থেকে যদি সরিয়ে দিই, তাহলে তো তোর কেল্লা ফতে রে।

সাধুর অট্টহাসিতে শ্মশানভূমি কেঁপে উঠল যেমন, তেমনি রাধামণির বুকের তলায়ও কাঁপন ধরল। এ কাঁপন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। রাধামণি কাঁপা গলায় বলল, ওর কোন অনিষ্ট হোক আমি চাই না। ওর দিক থেকে ওনার মনটা ফিরে আসুক—এইটুকু প্রার্থনা আমার।

বিকৃত গলায় একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল সাধু। রাধামণির দিকে কটমট করে তাকাল। দাঁতে দাঁতে কড়মড় আওয়াজ তুলে বলল, হুম, বুঝেছি।

সাধুর কোটরে পড়া গোল-গোল লাল করমচা চোখের ধোঁয়াটে তারা দুটো ঘুরতে লাগল। ডাইনে নিচে বাঁয়ে ওপরে।

দেখে দেখে রাধামণির মাথা ঘুরছে। সাধুর তামাটে রং. কালো দেখছে।

বটগাছ থেকে বুড়ো শকুনিটা নিচে নামল। ডানার ঝট্‌পট শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল রাধামণি। সাধুরও দু'চোখ রাধামণির কপালের সিঁদুরটিপে আটকেছে।

বলল, অমন হয়ে পড়ছিস কেন? একটা নারদভক্তিসূত্রের শ্লোক আওড়াল মুখে।—মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা···।

কিছুই বুঝল না। রাধামণি অবাক চোখে তাকিয়ে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল সাধু শ্লোকের মর্ম—

···মহতের কৃপা······সাধুদের কৃপা ভগবানের কৃপারই সামিল। বুঝলি? বুঝিসনি। তোর মুখই বলে দিচ্ছে। যাক, যা বলি শোন্। কাল এই সময় ওর একটা ছবি নিয়ে আসবি। সুরমার যে ছবিটা সব থেকে ভালো—সেইটা। আমার ওপর ভার। যা করার আমি করব। তোর ভাবনার কিছু নেই। ষট্‌কর্মর ক্রিয়া করব। একটাও বাদ দেব না। মারণ উচ্চাটন স্তম্ভন আকর্ষণ বিদ্বেষণ সম্মোহন।

এসব কথা কানে শোনেনি কখনো রাধামণি। না বাপের বাড়িতে, না শ্বশুরবাড়িতে। সাধুর রকমসকমে আর কথাবার্তায় ভীষণ ভয় ধরছে। সুরমার ওপর থেকে মনটা সরিয়ে দিলেই তো বজ্রকান্তকে ফিরে পায় সে। সুরমাকে নিয়ে এত করাকরির কি আছে!

মনের কথা গোপন করেনি রাধামণি, বলেছে। সাধু শুনে আঁকাবাঁকা দাঁত বার করে হেসেছে খানিক। হাসির ধমকে গণেশ-ভুঁড়ির পেটটা নেচে নেচে উঠেছে। হাসি থামলে বলল, খুব ভড়কে গেছিস দেখছি। বাড়ি চলে যা! সুরমার কোন খারাপ না হলেই তো হল। কাল ছবিটা আনতে কিন্তু ভুলিস নি।

ছবি চেয়েছে রাধামণি 'সুরমার কাছে। চিকঢাকা বারান্দায় সতরঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে বসে সুরমা। হাতীর দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুমকি চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। উঠল সুরমা। রাধামণিকে ঘরে নিয়ে এসে, দেয়ালে টাঙানো টেবিলে বসানো নানা ভঙ্গীর ছবি

দেখিয়ে বলল, যেটা পছন্দ নাও। সাধু বুঝি চেয়েছে? রাধামণি চমকে উঠল। জানল কেমন করে!

—চমকালে কেন ছোটবৌ? ফুলমালা চুমকিকে বলেছে সমস্ত। আর আমি কি তোমার ব্যথা কোথায় জানি না ভাই? আমি চাই তুমি শান্তি পাও। বজ্রঠাকুরের নজর-ধরা হয়ে থাকো। কত বলি, শোনে কই! এখানে আসবেই। এলে, না বসিয়েই বা উপায় কি বল!

যেটা সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার ছবি, নিজে টেবিল থেকে তুলে রাধামণির হাতে দিল সুরমা। হেসে বলল, সাধুকে বল না এই কাঁটাটাকে শেষ করে ফেলতে। তাহলে তমি বাঁচো. বজ্র বাঁচে আর সত্যি সত্যি আমিও বাঁচি।

—ওকথা মুখে এনো না দিদি।

—আমি তো সব পেয়েছি ছোটবৌ। তুমি যে কিছুই পেলে না। মেয়েছেলের কাছে যে সব ঐশ্বর্যের সেরা ঐশ্বর্য স্বামী—সেই স্বামীই বিমুখ। রূপ আছে, গুণ আছে, তবু বজ্র এমন কেন বুঝি না। বললুম তোমায়, আমার ঘোড়ায় চড়াটা ওর খুব পছন্দ। তুমি শিখে নাও আমার কাছে, তা-ও না। স্বামীর পছন্দই স্ত্রীর পছন্দ হওয়া উচিত। অত লজ্জাবতী লতা হলে চলে নাকি?

—দিদি, তুমি বিশ্বাস কর। ওকে বলেছিলুম। হো-হো করে হেসে উঠল ও। বলল, তোমাকে মানাবে না। সুরমার ভেতরের জিনিস। শিখে নিলে তো নকল হবে। আমার চোখে ভালো লাগবে না মোটে।

একটা দমকা নিশ্বাস ঝরে পড়তে পড়তে সুরমার বুকের কাছে আটকে গেছে। রাধামণির ছলছলে চোখ দেখে দু'চোখে জল ভরে উঠেছে। নিজের সিঁথির সিঁদুর আঙুলে চেপে একটুখানি তুলে নিয়ে রাধামণির সিঁথির সিঁদুরে বুলিয়ে দিয়েছে। চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, বোন, বজ্রর সুনজর পড়ুক।

সুরমাদি এ বাড়িতে কতবার এসেছে। যতক্ষণ থেকেছে, কত

হাসি কত গল্প। যে সময়ে বজ্র বাড়ি থাকেনি, সেই সময়েই এসেছে।

ফুলশয্যার রাতে রাধামণির মুখ দেখতে এসে কত আদিখ্যেতাই না করল। নিজের ফুলশয্যায় ভাসুরের দেয়া উপহার মোতির মালা গলা থেকে খুলে পরিয়েদিয়েবলল, স্বামীসুখী ওহ!

সমুদ্রের মত অত বড় হৃদয় না হলে কি কেউ নিজেরটা অপরকে এইভাবে বিলিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়?

রাধামণি তখন এ উপহারের মূল্য বোঝেনি। যত দিন গেছে তত বুঝেছে সুরমার মন কত উঁচুতে। সাধারণ মেয়ের প্রকৃতি নয় ওর। সংসার যাত্রার প্রথম দিনে প্রথম সুখের স্মৃতির মধ্যে নিজের সুখকেই দিয়ে গেছে রাধামণিকে চিরসুখী করে তোলার জন্য।

সুরমাকে যখুনি-যখুনি কাছে পেয়েছে, এক এক সময়ে রাধামণির এক এক রকম মনে হয়েছে। কখনো মা, কখনো বোন, কখনো এত আপনজন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই আর।

বজ্রকান্ত কি চায় কি পছন্দ করে—পাখী পড়ানোর মত করে বুঝিয়েছে, শিখিয়েছে। স্বামীর মন বসবে ঘরে। বরাত, হল কই! যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সুরমাকে চেনা দায়। মুখে বলে এক, কাজে করে এক। বিশ্বাস নেই ওকে। সত্যিসত্যিই যদি কোন সহানুভূতি থাকত রাধামণির ওপর, তাহলে কি বজ্রকান্তকে শাসন করে ও বাড়ি ঢোকা বন্ধ করতে পারত না? গ্রামের অনেকেই অপ্রিয় ওর ওপর। মেয়েছেলে হয়ে পুরুষের মত মালকোঁচা বেঁধে ঘোড়ায় চেপে বসবে। এখন সুরমাই তো ও বাড়ির কর্তা। বিনয়কৃষ্ণ হয়েছে সুরমা, আর সুরমা হয়েছে বিনয়কৃষ্ণ। বিনয়কৃষ্ণকে ঘোড়ার চাবুকে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে চলাচ্ছে ফিরোচ্ছে। চতুর্দিকে ছ্যা ছ্যা।

যুগলকৃষ্ণকে এমন হাত করেছে—সে যে শ্বশুর—নিজের অস্তিত্ব ভুলেছে। বৌয়ের ব্যাপারে বোবা অন্ধ। আর গিন্নী হেমনলিনী থেকেও নেই। তুক-গুণ জানে সুরমা। কুঁড়েঘরের মেয়ে উঠল

রাজপ্রাসাদে। ঘুঁটেকুড়ুনি থেকে হল রাজরানী। ধড়িবাজের একখানি। বারো বছর বয়স থেকে খলিফা। ঘোড়াচড়া শেখার নাম করে বিনয়কৃষ্ণকে মুঠোয় পুরল। এখন বিনয়কৃষ্ণের ঘরণী হয়ে নেচে-কুঁদে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে সারা গাঁও। কেন? প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখেছে, অসুখ-বিসুখে ওষুধ দিয়ে আসছে, খাবার-দাবার দিয়ে আসছে ঘোড়ায় চেপে! বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম খুইয়ে, শ্বশুরকুলের মুখে চুনকালি মাখিয়ে, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হয়ে উঠেছেন উনি।

নিন্দে শুনতে শুনতে রাধামণির কান ঝালাপালা। তালা ধরে যায়। বন্ বন্ করে মাথা ঘুরতে থাকে। ঘর থেকে বারান্দা থেকে ছাদ থেকে ঠাকুরঘরে গিয়ে পালিয়ে বাঁচে। রাধামণির মনে জ্বালা আছে সত্যি। মাঝে মাঝে সুরমারই ওপর ক্ষোভ দুঃখ অভিমান হয়। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই মনে হয়, মানুষট ঠিক মরণবিষ নয়।

সুরমার নিজের হাতে তুলে দেওয়া ছবি নিয়ে গেছে রাধামণি আচারীবাবা সাধুর কাছে। দেওয়ার আগে অনেক ভেবেছে—দেবে না দেবে না। শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে— দেবে। আচারীবাবা বলেছে, সুরমার কোন খারাপ হবে না। আর সুরমারও আন্তরিক ইচ্ছে, বজ্রর মন সরুক তার ওপর থেকে, রাধামণির ওপর দৃষ্টি পড়ুক। ছবি দিলে দোষের কিছু হবে না।

ছবি পাওয়ার পর সাধুর ঘন ঘন আসা-যাওয়া চলল বাড়িতে। বারমহলে বৈঠকখানায় শ্বশুরের কাছে আর অন্দরমহলে শাশুড়ীর কাছে। চুপি চুপি ফিসফিস কি কথাবার্তা হয় কি শলাপরামর্শ হয়, ওরা ছাড়া কাকে-বকে টের পায় না।

হাঁপিয়ে ওঠে রাধামণি। এমন কি ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে'যে তাকে গোপন করতে হবে।

তাকে দেখলে আলোচনা বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। শাশুড়ীর থমথমে মুখ, শ্বশুরেরও তাই। সাধুর মুখই ব্যতিক্রম কেবল। একটা

বিচ্ছিরি রকমের হাসি গড়াচ্ছে মুখময়। রাধামণির চোখে চোখ পড়লে, চোখ দুটোও কেমন হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের? না, তা নয়। আনন্দের? তাও না। তবে কিসের?

নিজেকে প্রশ্ন করে করে একটা উত্তরই পায় কেবল। একটা নিষ্ঠুর মানুষ ওই চোখের তারায় ঘোরাফেরা করছে। ওর শান্তি নেই একটা কোন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে না যাওয়া পর্যন্ত।

এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি সামনা-সামনি। দু-বাড়িরই রাস্তাটা খানিক তফাত হলেও, দু-বাড়ির ঘরের ভেতর দেখা যায়। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ির, ও বাড়ি থেকে এ বাড়ির। খুব স্পষ্ট না হলেও, মানুষজনের চলা-ফেরা ওঠা-বসা নজরে পড়ে।

এপাশের জানলাটা দিন তিনেক ধরে বন্ধ, সুরমার ঘরের। জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ধরে যাচ্ছে রাধামণির—সুরমার জানলাও খুলছে না, আর সুরমাকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অন্য ঘরে।

ঘরে তিষ্ঠতে দিল না রাধামণিকে। ওই বন্ধ জানলার ঘরটা কেবলি ডাকছে তাকে। আয় আয় আয়।

খাবার ঘরে ভাত মুখে তুলতে গিয়ে আবো অস্বস্তি। আলুভাতে দিয়ে গাওয়া ঘি মাখানো ভাতের ডেলাটা গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো। ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজানো কাঁসার বগিথালাটা হাতে করে ঠেলে দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। ওঠাব আগে জলের গেলাসে আঙুল ডোবাল একবার। মেঝেয় আসনের পাশে আঙুলে জলের দাগ কেটে বলল, সকলের অনুমতি চাইছি, শরীরটা ভালো নয়।

সকলের দৃষ্টি ফিরল রাধামণির দিকে। মুখে কেউ কিছু বলল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মহেশ্বরী বৌয়ের মুখখানা ভালো করে দেখল। বলল, ঠিক আছে। ফুলমালাকে গিয়ে বল গে—তোমায় যেন একটু পাতলা করে কাগজিলেবুর রস দিয়ে দইয়ের ঘোল করে দেয়।

ঘোল খেতে ইচ্ছে নেই রাধামণির। সটান চলে গেল সুরমাদের বাড়ি।

সুরমার ঘরের দরজাও বন্ধ। চুমকি এলো রাধামণিকে দেখে। বিমর্ষমুখ। বলল, রানীদির অসুখ। দিন রাত শুয়ে আছে। খাওয়ার রুচি নেই। ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে পড়ছে যাই যাই বলে। কাউকে ভাল লাগছে না। রাজাদাকেও। ছোটরাজাদা এসেছে, দেখা করেনি রানীদি। ছোট বৌরানীদি, কেমন যেন হয়ে গেছে রানীদি। আঁচলে দু'চোখ মুছল চুমকি।

ঘরের ভেতর থেকে ডাকল সুরমা, কে রে চুমকি? ছোটবৌ? দরজা ভেজানো, ভেতরে আসতে বল।

রাধামণি চমকে গেল ঘরে ঢুকে।

দু'তিনদিন দেখা হয় নি, সুরমাদির কি চেহারা হয়ে গেছে। বুড়িয়ে গেছে একদম। মুখের লালরঙের জেল্লা মরেছে।

সুরমার পায়ের কাছে থপাস ক'রে বসে পড়েছে রাধামণি। মুখে কথা সরছে না। চেয়ে আছে।

—অমন হয়ে গেল কেন ছোটবৌ? আমার কিছু হয়নি। ভালোই আছি। ঠোঁটের কোণে ম্লানহাসি ফুটে উঠল সুরমার।

রাধামণি বসতে পারছে না স্থির হয়ে। শত বৃশ্চিকের জ্বালা। সুরমার এই অবস্থার জন্য দায়ী সে-ই। নিশ্চয় সাধুর কোন ক্রিয়া-কলাপের ফল এটা। কেন মরতে ছবিটা সঁপে দিল হাতে। সাধুর মতলব ভালো ছিল না, গোড়াতেই তো কথাটা ফাঁস হয়ে গেছল।... সুরমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে কেল্লা ফতে।

রাধামণির ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছে।

একথা কাউকে বলার নয়। শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাধুর ইচ্ছেই ওদের ইচ্ছে। এখন করণীয় কি? কি করে সুরমাকে বাঁচানো যায়? একটা নির্দোষ মানুষ অকালে চলে যাবে, আর তার হেতু হবে রাধামণি—এ হতে পারে না।

সুরমা কি করবে? রাধামণির স্বামীর যদি সুরমা-সুরমা করে পাগল হওয়া ব্যামো হয়ে থাকে, তাহলে কি সুরমার দোষ? নিজের ঘর ঠিক নয় যেখানে, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বরাত ফেরানো যায় না। মায়ের মুখে তো এই কথা শুনেছে বরাবর। মা বলে, শত্রুরও অনিষ্টচিন্তা না করলে, সে-ও মিত্র হয়ে ওঠে একসময়। সকলের শুভচিন্তা করলে, সকলের মঙ্গলের সঙ্গে নিজেরও মঙ্গল হবে আপনা হতেই।

রাধামণি ভুল করেছে। অনুতাপ-অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। বসে থাকতে পারল না। সাধুর এই সুরমা-মারণযজ্ঞ বন্ধ করে দিতে হবে এই মুহূর্তে। খাট থেকে নেমে পড়ল রাধামণি। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুরমার ডাক কানে গেল না।

বাড়ীতে এসে বলেছে শাশুড়ীকে।—দু'সারি কাপড়ের পরদার ব্যবস্থা করা হোক এখুনি। সাধুর কাছে যাবে। তার ক্রিয়াকলাপের ফল ফলেছে। আনন্দ সংবাদ জানাতে যাবে সে নিজেই।

বৌয়ের কথামতো মহেশ্বরী ব্যবস্থা করেছে সমস্ত।

রাধামণিকে দেখে আচারীবাবা সাধু আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল। মড়ার খুলিতে কারণবারি পান করছিল, একনিশ্বাসে শেষ করে ফেলল। বলল, বস্, বস্। সুখবর আছে। তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

দেখছে সাধুকে রাধামণি একদৃষ্টে।

নিজের কৃতিত্বের কথা গড়গড় ক'রে বলে চলেছে সাধু। —মারণ আর আকর্ষণ—দু'টোই ফলবতী হয়েছে। তোর ভাগ্য ভালো। আমার ক্রিয়াকলাপ জ্যান্ত, বুঝলি? সুরমাকে কাবু করে এনেছি। রাতে ঘুমোতে দিই না, ওকে ডাকি। চিতার আগুনে দেখি ও জ্বলছে দাউ দাউ করে। ও স্বপ্ন দেখবে, প্রকৃত জ্বলার জ্বালা অনুভব করবে। ঘুমোতে ঘুমোতে ডাক শুনবে। কে ডাকছে ওকে? থামল সাধু।

রাধামণি শিউরে উঠল। সর্বনেশে কাণ্ড!

রাধামণির মুখ থেকে কোন কথা শোনার আশায় চুপ করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত সাধু। বিফল হয়ে প্রশ্ন করল, আমি তো খবর পেয়েছি ও অসুস্থ। তুই কিছু জানিস না?

চুমকি বলেছে রাধামণিকে, রানীদি ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে পড়ছে যাই-যাই বলে। সুরমাদি ভাঙল না, বলল,...কিচ্ছু হয়নি, ভালোই আছি। সুরমাদি এত ভালো—তাকে সহ্য করতে পারে না অনেকে। সেই অনেকের দলে রাধামণিও। কিন্তু সুরমাদি আগুনের জ্বালা তার জন্য নির্বিবাদে মুখ বুজে সহ্য ক'রে, দধীচির মত উৎসর্গ করে যাবে নিজেকে—কোনমতেই সহ্য করতে পারবে না রাধামণি।

রাধামণি বলল, আপনি কথা দিয়েছিলেন কি? বলেন নি—সুরমাদির কোন খারাপ হবে না?

—হাকিমের ওরকম সান্ত্বনা দিতে হয় রুগীকে। যা করছি, তোর ভালোর জন্যই করছি জানবি।

উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রাধামণির।—আমার স্বামী যেমন আছে, থাক। কিছু করতে হবে না আপনাকে। ছবি ফিরিয়ে দিন! দিন বলছি!

রাধামণির ঠাণ্ডা মূর্তি নেই আর। আগুনের হলকা ছুটছে দু'চোখ দিয়ে। হকচকিয়ে গেছে সাধু। এরকম হবে আশা করতে পারেনি। সামনে যাকে দেখছে, সে রাধামণি, না রণরঙ্গিনী শ্মশান-কালী, না সাধনায় দেবীদর্শনের আগে মিথ্যে বিভীষিকা!

মাথাটার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সাধুর। দেখছে, দেবী চিতার আগুনে সামনের বড় গামলা থেকে আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে চিতায় দিচ্ছে। সংকল্প ভঙ্গ, ক্রিয়াভঙ্গ।

শ্মশানের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের কাছে মড়াখেকো কুকুরটা গুটিশুটি হয়ে শুয়ে ছিল এতক্ষণ, একদিকে শকুনি আর এক-দিকে চিলের ঠোঁটের ঠোক্করে কেঁও-কেঁও কাতর আর্তনাদ করে উঠল।

সাধুর স্বপ্ন ভাঙল। আর্তনাদের মতই বলে উঠল সাধু, একি

করলি! সব পণ্ড করে দিলি! বলির রক্তে শেষ হোম করব—তার বদলে জল!

রাধামণি কেমন হয়ে গেছে। আঁজলার বদলে মড়ার খুলি করে জল তুলছে আর চিতায় ঢালছে। মুখে একই কথা—ছবি ফেরত দিন ছবি ফেরত দিন, ছবি ফেরত দিন!

রাধামণির পায়ের কাছে ছবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সাধু। পায়ে ঠেকেছে। রাধামণি মাথায় ঠেকিয়ে, বুকে চেপে ধরল ছবিটা।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, একটু শান্ত হয়েছে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, মাথা নুইয়ে প্রণাম করল রাধামণি সাধুকে। এ রাধামণি আলাদা। বলল, বাবা! আমায় ক্ষমা করুন।

—অদ্ভুত মেয়ে! নিজের ভালো নিজে হাতে ভেঙে ফেললি রে। এমন পাগল তো দেখিনি কোথাও! তোর ওপর আমার আশীর্বাদ রইল—বজ্রকান্তর মন ফিরবে তোর দিকে।

মাথার ওপর কে যেন ভর করেছিল, সারা দেহেও বুঝিবা। কি শক্তির নাচুনি রাধামণির ভেতরে! একটা যুদ্ধে মেতে উঠেছিল যেন। প্রলয় নেমে এসেছিল হয়তো এই শ্মশানে কিছুক্ষণের জন্য।

রাধামণি ক্লান্ত-অবসন্ন। ধীর পায়ে পরদা ঘেরা রাস্তায় নামল।

সে-রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে যাই যাই বলে আর উঠে বসেনি সুরমা। নির্বিঘ্নে রাত কেটেছে ঘুমের ঘোরে।

চেহারার কালো ছোপ মুছেছে সকালে। গোলাপী মুখে দ্বিগুণ জেল্লা। চিকন কালো ভুরুর তলায় কাজলতারা প্রাণ-খোলা হাসি হাসছে। এলোচুল-লুটোচ্ছে খাটে। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে সুরমা। ফলসা রঙের চওড়া জরিপাড় শাড়ী পরনে। আঁচলে রূপোর চেনে বাঁধা একগোছা চাবি। হাতে লাল চুনি বসানো মকরমুখো সোনার বালা। কানে কানপাশা, গলায় মটরমালা।

গয়না বেশী পরতে ভালোবাসে না সুরমা। নেহাত না পরলে নয়, আর তাছাড়া হেমনলিনীর চক্ষু সবদিকে। ঘরের-বৌ সাদাসাপটা থাকলে, তার আবার মনখারাপ। কাজে কাজেই শাশুড়ীর আদেশ

শিরোধার্য করতে হয় বই কি সুরমাকে মাঝে-মধ্যে। বালা ছেড়ে মানতাসা, মানতাসা-ছেড়ে রতনচূড়। মটরমালা ছেড়ে গিনির মালা, আবার গিনির মালা ছেড়ে জড়োয়ার চিক। পায়ে তোড়া ছেড়ে পাঁইজর। কানপাশা ছেড়ে কানবালা মাকড়ি কান ঢুল ফুল। পুরনো-নতুন কত না গয়না গায়ে তুলতে হয়। নানা জাতের রঙ-বেরঙের শাড়ী-ব্লাউজও পরতে হবে। আজ যেটা দেহ ছুঁল, কাল সেটা নয়, এ-বেলারটা ও-বেলা চলবে না।

রাধামণিকে দেখে, সুর ক'রে গেয়ে উঠল সুরমা, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু, দিন যাবে আজি ভালো।

—তুমি সুস্থ থাকো, ভাল থাকো সুরমাদি! আঁচল ঢাকা ছবিটা বার করে সুরমার হাতে দিল রাধামণি।

খাট থেকে নেমে বুকে চেপে ধরেছে রাধামণিকে সুরমা।—ঘুম হচ্ছিল না বুঝি? তুমি ছাড়া বজ্রঠাকুরের মনে আর কারো স্থান যেন না হয়।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুরমা চিবুকে তর্জনী বুলোতে বুলোতে কি যেন ভাবল। আলমারী খুলল। একটা ছোট্ট রূপোর কৌটো বার করে রাধামণির হাতে দিয়ে বলল, দোব দোব করে দেওয়া আর হয় না। তোমার নাম করে মদনমোহনের পায়ে থাকে থাকে বেলফুল চড়িয়ে যাচ্ছি আর মনে ভাবছি, বজ্রঠাকুরের মনের পরিবর্তন হোক। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। ফুল সাজানোর শেষে মদনমোহনের মুখে-চোখে হাসি ফুটে উঠতে দেখলুম 'যেন। কষ্টিপাথরের মূর্তি নরম-নধর হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাজানো ফুলের সবার ওপরের ফুলটা ঠিকরে এসে একেবারে হাতের ওপর আমার। মদনমোহনের আশীর্বাদী। শোয়ার ঘরের তাকে যত্ন করে রেখে দিও!

এসব রাধামণির জীবনে অতীতের স্বপ্ন। স্বপ্ন এই জন্য—সত্যি হলেও স্বপ্নের মতই তো হয়ে গেছে সমস্ত। এখনো তাকে তোলা সেই রূপোর কৌটো। ধুনোর ধোঁয়া লাগায় রোজ সকাল-সাঁঝে।

ক'বছর ধরেই তো চলেছে। এতদিনে তবে সত্যিই কৌটোর ফুলের ফল আর সাধুর কথা ফলল ?

রাস্তার জানলা রাধামণি খোলা রাখে কেন—বন্ধ করতে বলছে বজ্রকান্ত। রাস্তা দিয়ে যায় ঘোড়ায় চেপে সুরমা। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে আর চাইছে না, বোধ হয় ইচ্ছেও করছে না, তাই বন্ধ করে রাখার নির্দেশ।

খুশীমনে জানলার ধারে আসতেই, ধারণা পালটাল। ঘোড়ায় একা নয় সুরমা। পেছনে বসে আছে ভাসুর। বিনয়কৃষ্ণ।

মানুষটা কেন বন্ধ করতে বলেছে—বুঝতে আর বাকি নেই রাধামণির।

বিনয়কৃষ্ণকে দেখতে চায় না মোটে। সহ্য করতে পারে না। দেখলে কেমন হয়ে যায়। সমস্ত স্নায়ু অবশ। বুকের ভেতর ধড়ফড় করে। মুখখানা যেন মরা মানুষের মুখ হয়ে ওঠে।

ভাবতেও রাধামণির সর্বশরীর হিম হয়ে আসে। স্বামীর কথা ছেড়ে দিলে, সুরমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন। সুরমার জন্য একটা নিদারুণ ব্যথা কুরে কুরে খেতে থাকে ভেতরে। এ ব্যথা উপশমের কোন অব্যর্থ ওষুধ নেই। ত্রিভুবন খুঁজে বেড়ালেও মিলবে না। রাধামণির চোখেব জল উপচে-উপচে পড়ছে। বুক ভেসে যাচ্ছে।

যতদূর চোখ যায়, ততদূর দেখছে চেয়ে চেয়ে রাধামণি। সুরমার ঘোড়া ছুটছে। ছুটছে ছুটছে। খুরের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটাকেও আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে না আর। ঘোড়াটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে দৃষ্টি থেকে। খড়খড়ির পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে টেনে দিল রাধামণি।

জানলায় দাঁড়ানো আর সুরমাকে দেখার নেশা যাওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বেড়েই চলল বজ্রকান্তর। নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে নির্জনে, এক ঘরে বলে বসে। বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে আরো —সারাজীবনের সঙ্গী এটা। মৃত্যুর আগে অবধি যাওয়ার নয়।

জানলায় দাঁড়াবনা ভাবে। খুলবে না, বন্ধ করে রাখবে। কিন্তু কার্যগতিকে উল্টোদিকে উজান বইতে থাকে।

ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ বাতাসে ভেসে এলেই, তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে খাট থেকে। জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। বন্ধ জানলার পাল্লা দু'টো ছিটকিনি খুলে দু'দিকে সরিয়ে দেয়।

বাইরের বাতাস টেনে নেয় খানিক বুক ভরে। মনে হয় বন্দীদশা ঘুচল বুঝি। সে মুক্ত বিহঙ্গের মত মুক্ত। দু'হাতে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অধীর প্রতীক্ষা। সামনে দিয়ে যেতে এত দেরী কেন? পেছন দিক দিয়ে চলে যাবে না তো আবার?

শব্দ এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে সুরমার অপরূপ মূর্তি। প্রতিদিন একবার করে সুরমাদের বাড়িতে যাওয়া চাই বজ্রকান্তর। চোখের দেখা দেখেও আসে। আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই সুরমার। ঠিক আগেকার মত। বরং এখন বেশী। দেখা আদর পাওয়া সত্ত্বেও, ঘোড়ার পিঠের সুরমা অন্য। বিশেষ করে রাত্তিরে। সে কিবা জ্যোৎস্নায় কিবা আলো-আঁধারিতে কিবা অন্ধকার রাতে কিবা আকাশ আলোয়। ওর রূপ যেন ফেটে পড়ে। ত্রিভুবন ভোলানো ভুবনমোহিনী!

চোখের পিপাসা মেটে না দেখে দেখে। অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যের পর থেকে মুষলধারে নেমেছে। জলের ঝাপটা আসছে খোলা জানলায়। সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। তবু দাঁড়িয়ে আছে বজ্রকান্ত।

এ ব্যাপারে রাধামণি মৌন একেবারে। নীবব সাক্ষীর ভূমিকা তার। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ করেনি কোনদিন। করার প্রবৃত্তিও হয়নি তার, হয়ও না। মানুষটার ভেতরে একটা কষ্ট—বোঝে। বুঝলেও লাঘব করার উপায় কোথায়?

যখন দেখে, বজ্রকান্ত সুরমার অদর্শনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলেছে অনবরত, তখন রাধামণিরও চোখ ফেটে জল আসে' না দেখতে পেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আজো স্বামীর পাঞ্জাবি-ধুতি ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তির কাছে গিয়ে প্রার্থনা করল, ওকে শান্তি দাও তুমি।

ঝড়জল মাথায় করেও ঘোড়ায় চেপে আসছে সুরমা।

মুগ্ধ নয়নে দেখছে বজ্রকান্ত।

সোনার প্রতিমা তার ঘরেই উঠত। উঠল না বিনয়কৃষ্ণের জন্য। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। এ বংশের কেউ নয় ও, এ বংশের একফোঁটা রক্ত ওর শরীরে নেই, ভিন্ন বংশের ভিন্ন রক্তের। জেঠিমার জিদে রাত দিন হয়ে গেল, দিন রাত হয়ে গেল।

আজ ও-বাড়ির বিষয়-সম্পত্তি এমনকি সুরমাও তো তার হক-প্রাপ্য। সবেতে বঞ্চিত হল বজ্রকান্ত। নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই তাকেই তো দত্তক নেবে বলেছিল, জেঠিমার সায় ছিল তখন।

বজ্রকান্ত প্রায়ই দিনরাত থাকত ও বাড়িতে—জেঠিমার কি যত্ন কি আদর! গলায় ঢুকছে না, বেরিয়ে আসছে, তবুও ক্ষীর ছানা ননী মুখে ঠেসে দিত জেঠিমা। বলত, তুই তো সাক্ষাৎ মদনগোপাল—মদনমোহন।

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত রাঁধুনী বামুন কালীকিঙ্কর। জোরে

জোরে নিশ্বাস ফেলত বুক খালি ক'রে ক'রে। বড় হয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। তখন বোঝবার বয়স ছিল না। মাত্র ছয়। দৌরাত্ম্যে বাড়ি মাত করে রাখত। জেঠিমার ভয়ে বকতে বা মারধোর করতে সাহস করত না কেউ।

সে-সময় চুমকির মা ভাঁড়ারী। আমের দিন, আম খেতে খেতে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে। আমের আঁটি চুষছে। রসে মুখ হাত মাখামাখি। কনুই গড়িয়ে রস পড়ছে মেঝেয় টপ টপ করে।

চুমকির মা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার এঁটো হয়ে যাবে যে সব। কি দস্যি ছেলে, আবাব ছুঁতে আসছে। চুমকির মা মুখরা ভীষণ, কাউকে ভয়ডর করে না, মুখে যা আসে, বলে বসে। বলল, পাজী নচ্ছার। যাওনা, নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে এসব নষ্টামি করগে না। এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?

ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল জেঠিমা। চুমকির মায়ের কথা কানে গেল। জেঠিমার গলা এমনিতেই বেশ ভারী-ভারী। ঘোমটাটা মুখের কাছে বাঁপাশে টেনে ধরে ভারী গলায় জোরে জোরে বলল, কাকে কি বলছিস চুমকির মা? এ বাড়ি ওরই জানবি। ভবিষ্যতে ওই ছেলেই মালিক হবে। সাবধান কবে দিচ্ছি। ফের যেন এরকম কথা কোনদিন না শুনি।

সেদিনও কালীকিঙ্কর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলেছে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, আর একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে তার দিকে।

এরপর হঠাৎ-ই একদিন আবির্ভাব হল বিনয়কৃষ্ণর বাড়িতে।

কালীকিঙ্করের স্ত্রী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এসে হাজির হল। বন্যায় দেশ ভেসে গেছে, তাই আগমন। সঙ্গে বছর আষ্টেকের একটি ফুটফুটে ছেলে। কালীকিঙ্কর হাত ধবে নিয়ে এলো জেঠিমার ঘরে। ছেলেকে বলল, প্রণাম কর। মেঝেয় শীতলপাটির ওপর বসেছিল জেঠিমা।

পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল ছেলে। কালীকিঙ্কর হাউ

হাউ করে কেঁদে উঠল। কথা বেরোচ্ছে না, গলা ধরে গেছে। খানিক কেঁদে ধরাগলায় জেঠিমাকে বলল, রাণীমা, আপনি অন্নপূর্ণা। আমি তো পথের ভিখিরী হলুম। সর্বস্বান্ত হলুম। যেটুকু করে ছিলুম, সেটুকুও বানের জলে ভেসে গেছে। বাড়ি-ঘর ধসে গেছে, আমাদের ঠাঁই যদি না দেন মা, ছেলেটাকে চরণে ঠাঁই দিন, মরেও সুখ আমাদের।

কালীকিঙ্করের কি কান্না, থামার নাম নেই। কালীকিঙ্করের স্ত্রীও কেঁদে সারা। চুমকি আর চুমকির মায়েরও চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ছেলেটাও মা-বাবার কান্না দেখে ফোঁপাচ্ছে।

জেঠিমার চোখে কান্নার বন্যা নামল হু-হু করে। ছেলেটাকে কোলে টেনে নিল।

বজ্রকান্ত অভিমানে, রাগে ঠোঁট ফোলাতে লাগল। কারো লক্ষ্য নেই তার ওপর। সকলেরই এদিকে লক্ষ্য। ছেলেটার ওপর। ওর জন্য সবার চোখে জল। তার চোখে জল আসছে। কেউ তাকাচ্ছে না, কেউ কাঁদছে না তার জন্য। মনে হয়েছে ওই ছেলে তার দুশমন। জেঠিমার কোল দখল করল। ঘুষি মেরে ওর নাক ভোঁতা করে দেবে। চোখে আঙুল দিয়ে, চোখ গেলে দেবে। অন্ধ হয়ে যাবে।

কিচ্ছু করতে পারেনি বজ্রকান্ত। কতদিন চেষ্টা করেছে। দু'জনে মারপিট হয়েছে অনেক। দাঁতের কামড়ে নখের আঁচড়ে দু'জনেরই সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরেছে। এই পর্যন্ত। বজ্রকান্ত ইচ্ছে পূরণ করতে পারেনি নিজেই। সেই আপসোসেই মনোবেদনার অন্ত ছিল না।

এক এক সময় ছেলেটাকে নিয়ে কি উল্লাস বাড়িসুদ্ধ লোকের। বজ্রকান্তর গা চিড়বিড় করে ওঠে। জ্বালা ধরে। সমস্ত গায়ে কে যেন জলবিছুটি ঘষে দিচ্ছে।

ছেলেটা এসে অবধি যাওয়ার নাম নেই কোন চুলোয়। পাঁচ বছর ধরে রয়েই গেছে বাড়িতে। জেঠিমা ওকে ছাড়বে না বলেছে।

লেখাপড়া আর ঘোড়ায় চড়ানো শেখানো নিয়ে জ্যাঠা-জেঠি উঠে-পড়ে লেগেছে। ছেলের শিবশঙ্কর নাম পাল্টে বিনয়কৃষ্ণ রাখা হ'ল। জেঠিমারই দেওয়া নাম এটা।

হাড়পিত্তি জ্বলে যায় রকমসকমে। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে যেন ওরা। বিনয়কৃষ্ণকে যত্ন করে করেও আশা মিটছে না। এ বাড়ির ওই-ই সব। বজ্রকান্ত কেউ নয়। জেঠিমার কাছে অচেনা যখন, সকলের কাছে কোন পাত্তা পায় না তাই। চতুর্দিকে অবহেলা আর অনাদর।

গলা টিপে মেবে ফেলতে ইচ্ছে করে বিনয়কৃষ্ণকে। ভয়ে পেছিয়ে আসে। বহু বাব পরখ হয়ে গেছে লড়ে। অসুরেব বল ওর দেহে। ওকে কিছু না করতে পেরে, যাবা ওকে নিয়ে এত নাচানাচি করছে, সেই জ্যাঠা-জেঠির ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য বিদ্রোহী মন অস্থির হয়ে পড়েছে।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখেছে, নেই কেউ। পা টিপে টিপে পাথবের টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁচের ফ্রেমে আঁটা জ্যাঠা-জেঠিব ছবি বসানো গায়ে গায়ে। ঝপ্ করে দু'হাতে তুলে নিল দুটো ছবি। জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠোনে। শান বাঁধানো উঠোনে ঝনঝন আওয়াজ উঠল। ঘর থেকে পালাতে যাচ্ছে বজ্রকান্ত, ধরা পড়ল। এদিকে আসছিল, দেখে ফেলেছে চুমকির মা।

ছ'বছর বয়সে চুমকির মা-র মুখে যে কথা শুনেছে বজ্রকান্ত, তখন অবিশ্যি জেঠিমা তার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ কবেছে, আজ প্রতিবাদ করার কেউ নেই, জেঠিমা নিজেই বলল সেই কথা।—পাজী নচ্ছার! যাও না, নিজের বাড়িতে গিয়ে এসব নষ্টামি করগেনা! এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?

মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরেছে বজ্রকান্ত। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে মুখ লুকিয়েছে বালিশে। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ ফুলে উঠেছে।

মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কি হয়েছে—বজ্রকান্তকে

মুখ ফুটে বলতে হয় নি কিছু। আর জিজ্ঞেস করলেও নিজের এত বড় অপমানের কথা বলতে পারত না। মরে গেলেও না। লজ্জায় মাথা কাটা গেছে এমনিতেই। এ বাড়ির কথা ও বাড়িতে আর ও বাড়ির কথা এ বাড়িতে হাওয়ায় ভেসে আসা-যাওয়া করে। কানে কানে মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম কানাকানি শুরু হতে থাকে দু'বাড়ির দুটি ঝিয়ের মুখ থেকে। চুমকির মুখ থেকে কানে পৌঁছয় ফুলমালার, আর ফুলমালার মুখ থেকে চুমকির কানে। কানাকানি না হওয়া পর্যন্ত ওদের দু'জনের পেটের ভাত হজম হয় না।

ফুলমালার মুখেই মা শুনেছে সব। সান্ত্বনার সুরে তাকে বোঝাল, রাগ করে নিজের দাবি নিজের দখল ছাড়া, বোকামি। যা হওয়ার হয়ে গেছে। অমন কত কি ঘটে, রটে। গায়ে মাখলে চলে না। মন থেকে ঝেড়েমুছে ফেলে দিতে হয়। বিষয়ী ঘরের ছেলে, ঝড়ঝাপটা পোহাতে হবে অনেক। মন শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সই ভিত তৈরীর বয়স।

জেঠিমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না, বাড়ি যাওয়া। মা শুনে বলেছে, এ-বংশের কেউ নয়, সে ওই সম্পত্তির মালিক হবে, সহ্য করা যায় না। ধীরে ধীরে বিনয়কৃষ্ণকে হটাতে হবে ওখান থেকে তোমাকেই। তুমি জানতে দেবে না বিনয়ের ওপর অসন্তুষ্ট। ভেতরে যাই থাকুক—মুখে হাসবে কথা কইবে ভদ্রতা বজায় রাখবে। নিজের বাপ-ঠাকুরদার দেখেছি এ জিনিস। শ্বশুর-স্বামীরও দেখেছি। তোমার গায়ে এদের রক্ত বইছে। বংশের ধারা বাঁচিয়ে রাখা মস্ত বড় ধর্ম—মস্ত বড় কর্তব্য।

ও বাড়িতে আবার যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে বজ্রকান্ত। জেঠিমার কোলের কাছে বিনয়কৃষ্ণের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে গল্প শোনে। বিনয়কৃষ্ণ হাসলে, বজ্রকান্তর না হাসি পেলেও, জোর করে হেসে ওঠে।

চুমকির মাকে দেখলেই বলে, তোর শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে যে রে। নিজের দিকে নজর দে একটু। এসব অবিশ্যি বাবার কাছে বৈঠক-

খানায় বসে বসে পাঁচজনের কোন আচার-ব্যবহারে কে খুশী হচ্ছে—সে মোটা মানুষকে রোগা বলে, মিথ্যে বললেও—রপ্ত করেছে। কাজে লাগাচ্ছে।

বজ্রকান্তর সহানুভূতিতে চুমকির মা গলে পড়ল একেবারে। হেসে বলল, কি আর বলব খোকারাজা। তোমাদের সবার মুখ দেখতে দেখতে যেতে পারলে বাঁচি। মদনমোহনকে সাঁঝসকালে জানাই তাই। মুখখানা বড্ড শুকিয়ে গেছে খোকারাজা। রাঘবশাহী ভালোবাসো তুমি। দু'খানা নিয়ে আসি। আর গরুর বাঁট থেকে দোয়া দুধ—এইমাত্র দোয়া হল—গরম-গরম এক গেলাস।

মিথ্যে ছলনা আর পাটোয়ারী বুদ্ধিতে কি কারো মন সত্যিসত্যি পাওয়া যায়? কেউ পায় কিনা জানে না বজ্রকান্ত। তবে সে পেল কই? মোক্ষম-বঞ্চিত হয়েছে সব দিক দিয়ে। বিয়ের আগে সুরমাকে কত না বুঝিয়েছে, বিনয়কৃষ্ণ এ-বংশের কেউ নয়। একটা রাঁধুনীবামুনের ছেলের সঙ্গে—

—আমিও তো গরীব বিধবা বামনীর মেয়ে। কোন্ রাজপুত্তুর নেবে বল? বলেই ফিক করে হেসে ফেলেছে সুরমা।

—কেন—আমার মা-বাবা তোর মাকে ডেকে বলেনি? কত বলেছে।

—রাজী হবে কি করে বল—একটা ভয়তো রয়েছে। তোমাদের বিরাট নামডাক। আমাকে নিয়ে তোমাদের জ্ঞাতিস্বজনের সঙ্গে মন-কষাকষিটা কি ভালো?

—সে আমরা বুঝতুম। তোর অত মাথাব্যথা কেন?

—মাথাব্যথা আছে বই কি, আমি চাই না আমাকে নিয়ে কারো অশান্তি হোক কারো জীবন নষ্ট হোক।

—এসব বাজে বড় বড় বুলি ছাড়। এখনো সময় আছে, তোর মাকে বলে রাজী করা। বাবা তো বলেই দিয়েছে, পাকা বাড়ি বানিয়ে দেবে। ছেঁচা বেড়ার ঘরখানা তো নড়বড় করছে। কবে

না করে মাটি নেয়। খোলার চালে তো সহস্র ফুটো। তোর মায়ের দেমাক কত—শ্বশুরের ভিটে, এই আমার স্বর্গ। বৌ হয়ে ঢুকেছি, মা হয়ে বেঁচে আছি, এই ভিটের মাটিতে প্রাণ বেরোয় যেন। হ্যাঁ, প্রাণই বেরোবে। যে আশা করেছে তোর মা, সে আশা মিটবে না। গাড়ি বাড়ি হবে ভেবেছে, তা আর হচ্ছে না। মরার সময় মুখে জল পড়বে না বলে দিলুম। জ্যাঠাকে চিনতে বাকি এখনো। কাজের সময় মুখ মিষ্টি। এক পয়সায় মরে বাঁচে।

বিরক্ত হয়ে উঠেছে সুরমা। গম্ভীর মুখে ঝাঁঝালো স্বরে বলেছে, তুমি না পুরুষমানুষ? মেয়েদের মত এত ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লজ্জা করছে না? মা যা বুঝেছে, করেছে, করছে। আমি যা বুঝেছি, করেছি, করছি। অনেক বার তোমাকে বলেছি, আমাদের কোন ব্যাপারে নাক গলাবে না। বজ্রকান্তকে উত্তরের কোন সুযোগ না দিয়েই চলে গেছে সুরমা তুলসীতলা থেকে।

অপলকে তাকিয়ে থেকেছে বজ্রকান্ত তুলসীমঞ্চের দিকে। সুরমা জ্বেলে দিয়ে গেছে ছোট্ট মাটির প্রদীপ। কতক্ষণ জ্বলবে? যতক্ষণ তেল। তাও নয়। জোরে হাওয়া বইলে নিভবে এখুনি। আর তা না হলে, খানিক পরে আপনা হতেই।

জ্যাঠার শরীর খারাপ। দু-দুবার মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু কতদিন আর? তারপর তারই সমস্ত। দোতালার মার্বেল পাথরের ঘরে রাণী হওয়া সুরমার দুদিনের। প্রদীপের কাছে এসে দাঁড়াল বজ্রকান্ত। নিভছে না, বেশ জোরে জ্বলছে। হাওয়া তেমন নেই। নেভা না দেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চিত হতে পারছেনা। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল।

মানুষের ক্ষোভ দম্ভ যেখানে প্রতি পদে পদে পরাজিত, সেখানে এইভাবেই নিজের পরিতৃপ্তি নিজের শান্তি খোঁজে মানুষ। এটা আলেয়া দেখার মত মনের বিভ্রান্তি কতকটা, নিজের অক্ষমতাকে ঢাকার মিথ্যে প্রয়াস। ভেতরের শূন্য জায়গাটায় ক্ষণিকের জন্য মনগড়া নগণ্য চিন্তার একটা প্রলেপ মাত্র।

বজ্রকান্ত জানে সমস্ত, ও সম্পত্তি ফিরে আসার কোন উপায় নেই আর।

উকিল-মোক্তার ডেকে, সইসাবুদ শেষ। জ্যাঠা দত্তক নিয়েছে বিনয়কৃষ্ণকে। বাবার কথায় ক্ষেপে উঠে তিনদিনও তর সইল না। গ্রামময় ঢাক পিটিয়ে লোকজন খাইয়ে বিনয়কৃষ্ণ লোকচক্ষে সমাজ-চক্ষে যুগলকৃষ্ণের বংশধর নামে পরিচিত হয়ে উঠল।

এত তাড়াতাড়ি দত্তক নেয়ার মূলে বাবার অপরাধ—বাবা বলেছিল, তোমার যদি সুষমাকে ঘরের বৌ করে আনার এতই ইচ্ছে বজ্রের সঙ্গেই তো বিয়ে দিলে পার। বামুনের ছেলেটার চাল নেই চুলো নেই, বৌ নিয়ে রাখবে কোথায়?

—কেন—আমার বাড়িতে থাকবে।

—তুমি যত দিন আছ, না হয় রইল, পরে?

—পরেও থাকবে।

—পরেও! অন্তহীন বিস্ময়ে গলার স্বর জমাট হয়ে উঠেছে বাবার। একটু থেমে বলেছে, তোমার মত ভালোমানুষ পেয়ে বিনয় তো মাথায় উঠে নাচছে। ঘোড়া ছাড়া বাবুর ভুঁয়ে পা পড়ে না। রাঁধুনী বামুনের ছেলের নবাবি বলিহারি। কথায় বলে না, আদে-খলার ঘটি হ'ল, জল খেয়ে খেয়ে পেট ফুলল। এতখানি অন্যায় তোমার সহ্য করার ক্ষমতা আছে ভাই। আমি পারব না এসব বেয়াদপি বরদাস্ত করতে। আর তাছাড়া বজ্র জোয়ান ছেলে, ও কি এটাকে প্রশ্রয় দেবে? বুঝতেই তো পারছ রক্তগরমের বয়েস।

—বুঝেছি। দেখি, কি করা যায়। বলে, বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে জ্যাঠা। বাগানে ঢুকে পায়চারি করছে। ভুলুদাস ডান হাতে গড়গড়া বাঁ হাতে নলটা ধরে পাশে পাশে চলেছে। পুরনো দিনের চাকর। মালিকের কখন মেজাজ চড়া কখন মেজাজ নরম—হাড়হদ্দ জানা তার। সবে বিষ্ণুপুরের তামাকের মৌতাত লেগেছে বাবার। নলটা ঠোঁটে চেপে ধরেছে বার চারেক। তারপরই

মুখ-নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে ফরাশ পাতা তক্তপোশ থেকে উঠে পড়ল। মুখখানা লাল থমথমে।

ভুলুদাস ছোট তালপাতার পাখায় বাতাস করছিল ধীরে ধীরে। কলকের আগুন ঠিক থাকে যাতে। জ্যাঠার মুখে আগুনে মেঘ দেখে হৃৎকম্প তার। তবে সে জানে, এ অবস্থায় নলটা আবার মুখে ধরিয়ে দিতে পারলে চড়া থেকে খাদে নামবে মেজাজ।

ভুলুদাস মহা মুশকিলে পড়েছে। জ্যাঠা মুখও ফেরাচ্ছে না, তাকাচ্ছেও না তার দিকে। এমন চিন্তা এর আগে দেখেনি কখনো। আকাশ-পাতাল কি এত চিন্তা বুঝে উঠতে পারছে না ভুলুদাস।

বুঝল জ্যাঠার কথা কানে যেতে।—অ্যাঁ, আমি মলে তো এখান থেকে বিনয়কৃষ্ণকে তাড়িয়ে দেবে বাঁপ-বেটা। মানুষের জীবনের কোন ভরসা নেই—যা শরীর।

শুধু ভুলুদাস কেন—গাঁওসুদ্ধ সকলেই জানতে পারল দু'দিন না যেতে যেতেই। বিনয়কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ আর বজ্রকান্তর ভবিষ্যৎ। বিনয়কৃষ্ণ ওবাড়ির সর্বেসর্বা আর বজ্রকান্ত কেউ নয়।

বজ্রকান্ত বাড়ির কেউ নয়, সুরমারও কেউ নয়। তবুও মরীচিকার হাতছানি দেখে। পাগল হয়ে ওঠে। মনে হয়, তার হকের ধন মারে কে? একদিন না একদিন তার কব্জায় আসবেই ও-বাড়ি—ও-বাড়ির সব কিছু। ভেতরটায় হাহাকার করে ওঠে যখন, তখুনি মরীচিকার ছায়া। ছায়া মিলোলেই আবার হাহাকার।

সুরমার বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। এমন ঘটা গাঁয়ে-ঘরের আদ্দিকালের বদ্দিবুড়োরাও দেখেনি। ভৈরবীরাগিণী শুরু হয়েছে নহবতে ভোর হতে না হতেই। দিনের যখন যা রাগরাগিণী সে-সময় সে-সুর বেজে সন্ধ্যেয় পূরবীতে শেষ হয়েছে। পাঁচদিন ধরে সুরের রাজ্য ভেসে বেড়িয়েছে গাঁয়ের আকাশে বাতাসে। প্রায় সকলের মুখে একই কথা—স্বর্গ দেখেনি কেউ, স্বর্গ বলে যদি কোন জায়গা থাকে, সে এখানে—এই গাঁয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যাপার। পাঁচদিন তো গাঁয়ের ক

ঘরে হাঁড়ি চাপেনি উনুনে। ছেলেবুড়ো সব বয়সীরই নেমন্তন্ন যুগলকৃষ্ণর বাড়ি।

বজ্রকান্তর বাবা শুদ্ধকান্ত তো রেগে আগুন। নিজের লোকেদের কাছে নিজের প্রজাদের কাছে বলে বেড়িয়েছে, যুগলদার সব তাতে বাড়াবাড়ি। লিখে-পড়ে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েও এত ভয় কেন বুঝি না। হৈ-হল্লা ক'রে—এত টাকার অপচয় ক'রে, গ্রামসুদ্ধ লোককে ডেকে খাইয়ে সাক্ষী করে রাখার কোন মানে হয়। পরগোত্র নয়, এক রক্ত এক গোত্র—একেবারে নিজের জেঠতুতো ভাই। বুকের ভেতর কর কর করে। বাপ-ঠাকুরদা কি বংশের কারো বিয়ে থা দেয়নি নাকি? তাবলে এমনতর কাণ্ড একটা! ভিখিরী বললেও, অন্যায় কিছু বলা হবে না—একটা রাঁধুনী বামুনের ছেলের জন্য! দেখাল বটে!

বাবা যাই বলুক না কেন, বজ্রকান্তর ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছে একদম। বিনয়কৃষ্ণর কাছে হেরে গেল সে। ছ'বছর বয়স থেকেই হারছে। পনেরো বছর বয়স থেকে সুরমাকে হারানোর খেলা শুরু হয়ে গেল। চলল দুষ্টগ্রহের সঙ্গে লড়ালড়ি। বিনয়কৃষ্ণই তার দুষ্টগ্রহ, তার জীবনের রাহু-শনি।

বিনয়কৃষ্ণর ঘোড়ায় চড়া দেখে ছেঁচাবেড়ার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না সুরমা। বারো বছরের সুরমা বাইশের বল ধরে দৌড়ে আসত। টুকটুকে ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে দিত বিনয়কৃষ্ণর দিকে। ঘোড়ার পিঠে তুলে নেবে। তুলে নিয়েছে বিনয়কৃষ্ণ। সামনে বসিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে বজ্রকান্তর চোখে ধুলো উড়িয়ে দিয়ে।

নিজের নিশ্বাসের আওয়াজে চন্দ্রকান্ত নিজেই চমকে উঠেছে। নিশ্বাসে একটা জাতকেউটের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ যেন। একটা জাঁতাকল হৃৎপিণ্ডটাকে পিষছে। ঘোড়ায় চড়া শিখবে। ঘোড়ায় চড়া শেখার জন্য সুরমার ওদিকে আকর্ষণ। কিন্তু শিখবে কেমন করে? জ্যোতিষীর বারণ। পঁচিশ অবধি ফাঁড়া। মারাত্মক

আঘাত লাগা—জীবন সংশয়—কিছু অসম্ভব নয়। বরং ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা নিশ্চিত।

বাবার সঙ্গে অনেক জেদাজেদি হয়েছে শেখা নিয়ে। বাবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। কিছুতেই না, যা হবে, পঁচিশের পর।

তার আগেই তো সুখের ভিত ফেটে চৌচির। পঁচিশে পড়তে আর হল না। তার বছর আষ্টেক আগেই, সতেরোয়—সুরমাকে পাওয়ার আশা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। পঞ্চদশী সুরমা লাল বেনারসী পরে সোনা-জহরতে মোড়া গায়ে জ্যাঠামশাইয়ের ঠাকুরঘরে মদনমোহনকে প্রণাম করল বিনয়কৃষ্ণব সঙ্গে। বিনয়কৃষ্ণর জীবনসঙ্গিনী সুরমার মাথায় মদনমোহনের চরণ-তুলসী ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করল জেঠিমা।—সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকুক, হাতের লোহা অক্ষয় হোক।

বিয়ের পর সুরমার কি যত্ন। বজ্রকান্ত যাব না যাব না মনে করেও নিজের অগোচরেই গিয়ে পড়েছে ও-বাড়িতে। সুরমা থালা-ভর্তি নানারকমের মিষ্টি এনে, নিজে বসে বসে খাইয়েছে। হাসতে হাসতে গল্প করেছে কত। অন্যমূর্তি একেবারে। বিয়ের আগের দিন অবধি কি ঘেন্না। দেখেই বলেছে, তোমাকে আমার পুরুষমানুষ মনে হয় না। মনে হয় আমার মত একটা মেয়েছেলে তুমি। পুরুষমানুষ কাকে বলে বিনয়দাকে দেখে শেখো। কিরকম ঘোড়া দৌড় করায় বল তো। কিরকম শক্তি শরীরে, কিরকম সাহস!

বাবার ওপর রাগ ধরেছে বজ্রকান্তর। বাবার যত গোঁড়ামি! জ্যোতিষীর কথায় তাকে ভীতু করে রেখে দিল, তার জীবনটা বরবাদ করে দিল। মনে মনে জ্যোতিষীর মুণ্ডপাত করেছে আর বিনয়কৃষ্ণর বুকের ওপব বাসিহাজরাব নাচ নেচে-নেচে হাড়পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

বাসিহাজরার নাচ দেখেছে শিবের গাজনে। চৈত্রসংক্রান্তির পরদিনে।

আগের সন্ধ্যেয় জঙ্গলের ভেতর মাটির বেদিটার ওপর হরগৌরীর পুজো হল। এক অঙ্গে দুটি রূপ। ডানদিকে হর, বাঁদিকে গৌরী। ডাকের সাজে সাজানো মূর্তির অঙ্গ দিয়ে বিদ্যুতের ছটা ঠিকরে পড়ছে।

তিন দিন ধরে উপোসী-ব্রতী লোকটার পূজো দেখতে দেখতে ধ্যানতন্ময় দেহটা থর থর করে উঠল। ভক্তরা সমস্বরে বলে উঠল, শিব এসো, গৌরী এসো। উপসীর হৃদয় মাঝারে।

দুলছে উপোসী-ব্রতী। আদুড় গায়ে কৌপিন পরা জোয়ানের দুলুনির গতি ক্রমশ বাড়ছে। পুরোহিত গৌরীর পায়ের জবাফুলটা মাথায় বুলিয়ে দিয়ে ব্রতীর মুখে ঠেকিয়ে রেখে দিল।

মেলা দেখে, পূজো দেখে যে যার ডেরায় গিয়ে উঠেছে। উঠল না একজন ব্রতী। সারারাত একাসনে বসে বসে নিজেকেই শিবদুর্গা ভেবেছে মনে মনে। ডান অঙ্গ শিব, বাঁ অঙ্গ দুর্গা।

ভোরে ভক্ত-পূজারীর দল আর পুরোহিত এসে হাজির। পুরোহিত পূজোর প্রসাদীফুল দু'হাতে ভরে নিয়ে ব্রতীর মাথায় ছড়িয়ে দিল। একটা ফুল ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিল। ব্রতীর সর্বশরীর ভয়ানক কেঁপে উঠল। যেন একটা প্রবল শক্তি বয়ে গেল ওর শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে। বুকটা ফুলে উঠল চতুর্গুণ, সেই সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ। ওকে বিরাট দেখাচ্ছে। ঢাকের পিঠে কাঠি পড়ল। উন্মাদনার বাজনা উন্মত্ত নৃত্যের বাজনা বেজে উঠল বনভূমি কাঁপিয়ে। কাঁপছে মেলার দোকানপসারী ক্রেতা-বিক্রেতা আগন্তুক-দর্শক। কাঁপুক—এ কাঁপার মধ্যে একটা অব্যক্ত আনন্দ থরে থরে সাজানো। চামড়ার তলায় তলায় আনন্দ চোঁয়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এ আনন্দের ভাগ সকলকে দিলেও অফুরন্ত থেকে যাবে। এর শেষবেশ নেই।

বজ্রকান্তর এ আনন্দেও বিষণ্ণের ছায়া নেমে এলো।

দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে দু'জনে। বিনয়কৃষ্ণ আর সুরমা। দু'জনে হেসে কুটিকুটি তাকে দেখে। বেহায়া আর কাকে বলে! বাসিহাজরার নাচ দেখতে এসেছে ওরা তার মত। এই উপোসী ব্রতীই বাসিহাজরা। নাচবে।

ঢাকের তালে তালে দুলতে লাগল বাসিহাজরা। বসে বসেই নাচছে যেন। উঠল আসন ছেড়ে নাচের ভঙ্গীতে। দু'চোখ খুলে তাকাল বড় বড় করে। রক্তজবা চোখ।

নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে জঙ্গলের ভেতর থেকে। কি নাচ। হিমালয়ের চুড়ো খসে পড়ে বুঝি। কি শক্তি। সামনে যে কেউ পড়বে, হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে যাবে। মাটি থেকে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, শূন্য থেকে লাফিয়ে পড়ছে মাটিতে। আকাশ-মাটি জুড়ে নাচ চলছে বাসিহাজরাব।

লোকে মুগ্ধ, লোকে তটস্থ।

নাচতে নাচতে এগোচ্ছে নদীর দিকে। যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীর জলে। শক্তসমর্থ জোয়ানরা জলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গোল হয়ে।

নাচতে নাচতে বাসিহাজবা ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের ওপর। ধরে রাখতে পাবে না বিশটা জোয়ান। একজন ঠোঁটের তলাব ফুলটা আঙুল দিয়ে টেনে বাব করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসিহাজবা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বেহুঁশ হয়ে গেছে।

বজ্রকান্ত সকলের অলক্ষ্যে শিবতুর্গাব প্রসাদীফুল লুকিয়ে মুঠোয় পুরেছে। বাড়ি ফিবে মুখে পুরেছে। মনে মনে ভেবেছে, সে বাসিহাজরা। নাচছে। নাচতে নাচতে বিনয়কৃষ্ণর বাড়ি গেছে। বিনয়কৃষ্ণর বুকের ওপর নাচছে। কল্পনা কল্পনাই থেকেছে। চোখ খুলে দেখেছে, খাটে যেমন পা ঝুলিয়ে বসেছিল, তেমনি বসেই আছে। বাসিহাজরাব মত তাব দেহে কোন শক্তির আবির্ভাব হয়নি। আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে নিজেকে। যেমন তেমনই আছে। সেই ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতি। সেই মাঝারি গডন। খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়। তার কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হতে পারল না সে। না বিনয়কৃষ্ণ, না বাসিহাজরা। সুরমাব মন টানবে কি দিয়ে?

ভালো লাগে সুরমার শেল-বেঁধানো ভৎসনা। ভালো লাগে ওর ঘোড়ায় চড়া। সব ভালো লাগার জলাঞ্জলি হয়ে গেল সুরমা হাতছাডা হয়ে যাওয়ায়।

সুরমাই উঠিপড়ি চেষ্টা করে বিয়ের কথা পেড়েছিল মায়ের কাছে —লক্ষ্মীমন্ত পছন্দসই মেয়ে বাধামণি। মুচকে হেসে বজ্রকান্তকে

বলেছে, বজ্রঠাকুর, মাথায় জল দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবার। একটা দজ্জালনীকে দিয়ে তোমার কি করি ছাখো না। সদাই রুষ্ট, তুষ্ট হতে আর দেখলুম না। এইবার বুঝবে 'খন।

—কোন দজ্জালনীই টিট করতে পারবে না আমায় বৌঠান। একজনই পারত—

খিলখিল করে হেসে উঠেছে সুরমা। বলেছে, তোমার দাদার জলখাবারটা পাঠিয়ে দি। আমি হাতে করে না দিলে, ওর আবার খেয়ে তৃপ্তি হয় না। এখুনি আবার বেরোতে হবে দু'জনকে। চাষী-পাড়ায় বড্ড জ্বরজ্বালা শুরু হয়েছে। ওষুধ নিয়ে যেতে হবে আমাদের।

সদর থেকে বেরোনোব মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে বজ্রকান্ত। ঘোড়ার পিঠে সুরমা-বিনয়কৃষ্ণ। খট খট খুরের শব্দ তুলে ছুটল সাদা ঘোড়াটা।

মনে হল, তার বুকখানা ঘোড়ার লোহার খুরে চিরে-ফুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

শয়তান বিনয়কৃষ্ণটাকে—ছুটে গিয়ে, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে, ঘাড় ধরে মুখ গুঁজড়ে মাটিতে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে। সুরমাকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বিনয়কৃষ্ণকে ঘোড়ার পায়েব তলায় থেঁতলে দিয়ে পিষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছে।

বজ্রকান্তর সর্বক্ষেত্রেই ফাঁকা ইচ্ছেটা সম্বল হয়ে ওঠে। ওই পর্যন্ত। বেশীদূর গড়ায় না। নাগালের বাইরে, ক্ষমতার বাইবে। কবে ইচ্ছেপূরণ হবে—

ঘোড়া থেকে পড়ে অপঘাতে মরবে কবে বিনয়কৃষ্ণ। কবে, কবে ?

বজ্রকান্তর আগের সতেরো বছর পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। সতেরোয় আট বছর যোগ হয়ে পঁচিশে পৌঁছেছে। এখনো দেখে সুরমাকে। ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। ওকে একা ভালো লাগে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে কাছে। হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এসে দুটো কথা কইবে একান্তে।

সুরমা তার কাছে এখনো সেই ছোটবেলার সুরমা। *বিয়েতেও ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির—চারচোখে চাওয়াচায়ির সময় রাধামণির* মুখে সুরমারই মুখ দেখেছে সে। এখনো রাধামণিকে দেখলেই সুরমাকে দেখে। রাধামণি তার মনের জগতে মৃত।

জানালার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বজ্রকান্ত। সুরমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলে যেতে দেখেছে ওদিকে। তবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, আসবে আবার এই পথ দিয়েই। না দেখে জানালার ধার থেকে এক পা-ও সরবে না বজ্রকান্ত।

ঘরে ঢুকেছে পা টিপে টিপে রাধামণি। স্বামীকে এখনো এক-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক। কাছে যেতে গিয়ে থমকাল। ঘরে একজন ঢুকেছে, মানুষটার সাড়া নেই। ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

কালো মেঘে ঘন ঘন নীল বিদ্যুতের আলো চমকে চমকে উঠছে। বৃষ্টির গতি বাড়ছে। ঝমঝম আওয়াজটা বিশ গুণ জোরে শোনাচ্ছে। মেঘের গুড় গুড় শব্দে বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠছে রাধামণির। বুক কাঁপছে, বাড়ি কাঁপছে, ঘরখানা বড্ড বেশী কাঁপছে।

বজ্রকান্ত এতটুকুও কাঁপছে না। গোটা দেহটা ধীর-স্থির। একটা পাথরের মূর্তি। খানিক তফাতে পেছনে দাঁড়িয়ে রাধামণি। রাধামণি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাইরে একটা বাতাস ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে গোল হয়ে। ঠিক জানালার রুজু-রুজু। জামগাছের তালগাছের মাথা ঘুরিয়ে মুচড়ে দিচ্ছে।

একটা অজানা ভয় রাধামণিকে পেয়ে বসেছে। রাতটা কি ভয়ানক হয়ে উঠছে! কি নির্মম হয়ে উঠছে!

অপলক চোখে দেখছে বজ্রকান্ত।

ফিরে আসছে সুরমা। ঝড়বৃষ্টিতে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে। বজ্রকান্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। ঘোড়াটা কি যেন শুঁকছে। কখনো মুখ উঁচু করে, কখনো মুখ নীচু করে। ভীষণ অস্থির।

আসতে আসতে পেছন ঘুরে আবার ছুটল। আবার আসছে আবার ছুটছে। ঘোড়াটা মাথা দোলাচ্ছে এদিক-ওদিক।

মেঘের আকাশ ফাটানো কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল দূরে। চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলো হয়ে উঠল পথ ঘাট বন। বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো বজ্রকান্তর। সুরমা আসছে, পেছনে বসে বিনয়কৃষ্ণ।

জানালার ধার থেকে ছিটকে এসে পড়ল বজ্রকান্ত বিছানায়। চিৎকার করে উঠল, জানালা বন্ধ কর, জানালা বন্ধ কর।

রাধামণি বন্ধ করে দিল জানালা। স্বামী ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

রাধামণি জড়িয়ে ধরল।

জড়ানো গলায় বজ্রকান্ত বলল, কে—সুরমা?

সুরমা যা খোঁজে তা পায় না। এ খোঁজার কি অন্ত নেই তার।

প্রতি দিনের মত আজো ভাবছে। প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে গেল চুমকি। সন্ধ্যে নেমেছে। দুচোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে উঠছে। এসময়ে এই রকমই হয় রোজ। এত আলস্য জড়িয়ে ধরে, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। মাসখানেক ধরে এই ব্যামো ধরেছে তার।

চুমকি ডাক্তার-কবিরাজ দেখাতে বলে। সুরমা রাজী হয় না। বলে, তুই এত ভাবিস কেন? ভয় নেই, সহজে মরব না আমি অদৃষ্টে দুর্ভোগের শেষ নেই রে আমার। বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে সুরমা।

ঘুমোচ্ছে। ঘোড়াটা বারমহলের আস্তাবল থেকে ডেকে উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সুরমা। দুহাতে দুচোখ রগড়ে নিয়ে নামল খাট থেকে।

ছেলেদের মত মালকোঁচা বেঁধে কাপড় পরল। নেমে গেল নিচে তর তর করে। চুমকি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে সমস্ত। দুচোখের জলে ভেসে যাচ্ছে বুক। এ দৃশ্য দেখছে সে নতুন নয়। দেখে প্রতিদিন। রানীদির ভরসন্ধ্যেয় ঘুম, ঘোড়ার চিঁ-হিঁ-হিঁতে উঠে পড়া, কাপড় পরা, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটাকে বার করে পিঠে মুখ ঘষবে খানিক। তারপর চেপে বসবে। জঙ্গলের দিকে যাবে।

চুমকি জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। কালকের মত আজ আর আকাশে ঘনঘটা নেই। বোঝাই যায় না দুর্যোগের রাত গেছে কাল। আকাশের নীলে জ্যোৎস্নার ঝলমল।

চুমকির চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। আঁচলে থুপে থুপে মুছে নিচ্ছে আর দেখছে। যতটুকু দেখা যায়। একটু পরে, সুরমা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। আবার আসবে, আবার চলে যাবে। আবার আসবে, আবার চলে যাবে। কিছুক্ষণ চলবে এই আসা-যাওয়ার টানা-পোড়েন পর্ব। তারপর হতাশায় ভেঙে পড়ে, বাড়ি ফিরে বিছানায় ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজাবে।

এ মর্মান্তিক যাতনা দেখা যায় না। চুমকি ঘরে গেলে বলে সুরমা, আমার কাছে আসবি না, একা থাকতে দে আমাকে।

সুরমার ঘোড়াটা মিলিয়ে গেল চুমকির চোখ থেকে। তবু চুমকি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকবেও বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত।

আজ থেকে একমাস আগে, সেটাও পূর্ণিমার সন্ধ্যে। চুমকির মত জানালায় দাঁড়িয়ে সুরমা। ঘোড়া ফিরে আসার খট খট আওয়াজ শুনে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলো বোজের মত। বামুনঠাকুর কড়ায় ঘি চাপিয়েছে, বিনয়কৃষ্ণ এসে খাবে। লুচি বেলছিল।

সন্ধ্যের মুখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে সুরমা। সেই থেকে আজ অবধি ওই সময়ে সে-ঘুমের ব্যতিক্রম হয়নি একদিনের জন্য। একটু পরে ঘুম ভাঙতেই কেঁদে উঠল। চুমকিকে বলল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে চুমকি।

চুমকি হতভম্ব। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে সর্বনাশ দেখল কোত্থেকে। মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি? এরকম তো বলেনি কখনো। এমন করে কাঁদেনি কখনো।

চুমকিকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি—কেন এমন বলছো? সুরমা নিজেই বলে।

— একি স্বপ্ন না সত্যি রে চুমকি? কি দেখলুম আমি।

জানালায় এসে রাস্তা দেখেছে। বিছানায় ফিরে এসে বসেছে আবার। বলেছে, আমি যেন পরিষ্কার দেখলুম ওকে। স্পষ্ট শুনলুম ঘোড়ার চিৎকার, কি বীভৎস! ঘাড়ের কাছটা দিয়ে গল গল করে

রক্ত বেরোচ্ছে ওর। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একটু। মুখে কথা নেই, আমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো কি করুণ।

এ স্বপ্ন দেখলুম কেন?

কাজল চোখের কানায় কানায় জল টলমল করছে সুরমার। হু-হু করে বইতে শুরু করল।

—রানীদি, কেন মিথ্যে মিথ্যে অমঙ্গল চিন্তা করছো রাজাদার? স্বপ্ন কারো ফলতে তো দেখিনি আমি।

—স্বপ্নে যা দেখলুম, ঘুম ভেঙেও তাই দেখলুম যে আবার। ও দাঁড়িয়ে। দুচোখে কি যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। নিজে ঘুমিয়ে আছি, কি জেগে—পরখ করার জন্য ঘড়িটার দিকে তাকালুম। সাড়ে ছ-টা। টক টক আওয়াজ কান পেতে শুনলুম ভালো করে। আমি ঠিকই দেখছি, ঠিকই শুনছি। ওকেও ঠিকই দেখছি। ও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলুম দালানে। কোথাও নেই। বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে উঠেছে।

—ওসব কিচ্ছু নয় রানীদি। তুমি ঠাণ্ডা হও। মদনমোহনের ঘরে গিয়ে একটু বস দিকিনি। ধুলরুচাষার বৌয়ের খুব অসুখ, রাজাদা ফেরার সময় দেখে, ওষুধ দিয়ে আসবে বলে গেছে। একটু দেরী হচ্ছে ওই জন্য।

অস্থির পায়ে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে সুরমা। দেখছে। ঘোড়াটা একা আসছে। ঘোড়ার পিঠের মানুষ নেই। সুরমার বুকে-গলায় অসহ্য যন্ত্রণা ডেলা বেঁধে আটকে গেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট।

নিচে নেমে এলো, পেছু পেছু নেমে এলো চুমকিও।

যা দেখল, সুরমাকে সামলাবে কি, চুমকির নিজেরই মাথা ঘুরে উঠল। ঘোড়ার পিঠে চাপ চাপ জমাট রক্ত।

দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে সুরমা।

জ্ঞান হতে কেবলি দেখেছে, বিনয়কৃষ্ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে। অস্পষ্ট, খানিক দূরে। যেদিকেই তাকিয়েছে, সেইদিকেই দেখেছে।

তাকে ঘিরে রয়েছে যেন ও। তিনদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বিনয়কৃষ্ণর লাশ পাওয়া যায়নি। চতুর্থদিন চলনবিল থেকে পাওয়া গেল। হেঁসোর কোপ শুধু ঘাড়ে নয়, সর্বাঙ্গে। জলে ফুলে ঢোল, বিকৃত হয়ে গেছে।

দেখে, সুরমার দু'চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মৃতদেহটাকে দেখতে দেখতে মানুষটাকেই দেখেছে দাঁড়িয়ে থাকতে।

শ্বশুর চলে যেতে বিনয়কৃষ্ণর ভার সুরমার হাতে ছেড়ে দিয়ে কাশীবাসী হয়েছে শাশুড়ী। যাওয়ার সময় বলে গেছে, বিনয়ের শত্রু অনেক। সাবধানে থেকো, সাবধানে রেখো ওকে! সাবধানে রাখতে হল না আর। সব শেষ হয়ে গেল।

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুরমা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোন সন্ধান পেল না খুনীর। সন্দেহের পাহাড় গড়ে উঠেছে মনে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সকলকেই মনে হয়েছে খুনী। বিনয়কৃষ্ণকে ষড়যন্ত্র করে খুন করেছে।

ওবাড়ির খুড়শ্বশুর ওবাডির খুড়শাশুড়ী। ওদের প্রজারা, আর প্রজাদের মাথা বজ্রকান্ত। বজ্রকান্তকে সন্দেহ করলেও, সে-সন্দেহ টুকরো টুকবো হয়ে ভেঙে গুড়িয়ে হাওয়ায় মিশিয়ে যায় তখুনি।

বজ্রকান্তর দ্বারা একাজ অসম্ভব। ও ভীতু কাপুরুষ। কোন হিম্মতেব পরিচয় পায়নি ওর কাছ থেকে কোন সময়। বিনয়কৃষ্ণ নৃশংসভাবে খুন হওয়ায় ও তো কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হয়ে গেছে। প্রতিদিন অন্তত একবার করে না এসে পারে না এ বাড়িতে।

কালাপাড় ধুতিপরা নিরাভরণা সুরমাকে দেখে, চেয়ে থাকতে পারে না, চোখ ফিরিয়ে নেয়। উঠে চলে যায় মুহূর্তের মধ্যে কথা-বার্তা না কয়ে। বজ্রকান্তও গাঁয়ের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, অন্তরঙ্গ হয়েও কোন হদিস বার করতে পারেনি খুনীর।

মনমরা হয়ে বলেছে সুরমাকে, বৌঠান, খুনী ধরা পড়বেই একদিন। দেখো, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। আমার মন বলছে। দেখো, মিলতে বাধ্য। তুমি স্থির হও একটু।

স্থির হওয়া কি কথার কথা! সুরমার কানে যায় না কারো কোন উপদেশ। স্থির থাকতে পারে না ঘরে। বিশেষ করে সন্ধ্যে-বেলায়। তাকে জোর করে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় কে। কানের কাছে মুখ এনে কে যেন বলে—কার গলা বুঝতে পারে না—তবে কি বলছে, বুঝতে অসুবিধে হয়না মোটে—চ', চ'না, খুনী কে দেখতে পাবি, জানতে পারবি।

চুমকি শুনে ভাবে, কই সে তো কারো কথা শোনেনা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার একটা লক্ষ্য করছে চুমকি। রানীদির সন্ধ্যেয় ঘুম, ঘোড়াব ডাকে উঠে পড়া, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সব যেন কেমন কেমন!

রানীদিকে বলে বন্ধ করতে পাবেনি চুমকি। সত্যিসত্যিই ও সময়টায় রানীদি যেন অন্য পৃথিবীর লোক। এমনভাবে চ'লে যায়, কে যেন ডেকে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায় কে জানে। কোন-দিন রানীদি এসে মুখ খোলেনি। পরেও না, তারপরও না। রানীদির মনে থাকে কিনা, তাই বা কে জানে। একটা কোন ঘোরের মধ্যে দিয়ে রানীদি আসা-যাওয়া করে।

চুমকি দেখতে পাচ্ছে সুরমাকে এবার। আসছে। না, আসতে আসতে লাগাম ধরে ঘোড়াব মুখটা আবার ঘোরাল। যাচ্ছে।

ঘোড়াটা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুরমা নামল। ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ এনে বলল, এখানেই কি? বল না পুষ্পরথ!

পুষ্পরথ নাম রেখেছিল বিনয়কৃষ্ণ। নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে গলা ধরে এলো সুরমার। পুষ্পরথের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। এইখানেই বসত সে। তার রক্তে ভিজে গেছল ও। ঘোড়ার পিঠে মুখ গুঁজে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সুরমা। ঘোড়াটারও দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়াটা কাছে এলে, স্পর্শ করলে সুরমার একটা নতুন অনুভূতি জেগে ওঠে। যেটা বিনয়কৃষ্ণর সময় হত না। বিনয়কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর হচ্ছে, হয়। যেন বিনয়কৃষ্ণরই কাছে এসেছে, ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে বিনয়কৃষ্ণর পরশ পাচ্ছে।

পুষ্পরথ জোরে জোরে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। পেছনের পা দুটো দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। আকাশের দিকে মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে শুনল কি। তারপর সামনের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল। চড়ে বসল সুরমা।

এই ঘোড়ায় চড়া নিয়ে কত টিটকিরি কত না বিদ্রূপ গাঁয়ের লোকের। বাক্যবাণের বিষ বিঁধিয়েছে তার চেয়ে বিনয়কৃষ্ণর গায়ে বেশী। ধিঙ্গী বৌকে নিয়ে কত বাহাদুরিই না দেখানো হচ্ছে। দু'জনে মিলেছে ভালো। কথায় বলে, যেমন হাঁড়ি তেমন সরা, বিধাতার মিলন করা। হাঘরের ছেলে আর হাঘরের মেয়ে, বনেদি ঘরের মর্ম বুঝবে কেমন ক'রে।

আড়ালে-আবডালে বিনয়কৃষ্ণকে ধুনুরি-রাজা বলে কি উপহাস। রাজা যখন রাজকুমার ছিল, বাল্যবন্ধুকে কথা দিয়েছিল, রাজা হলে, কিছুদিনের জন্যও রাজসিংহাসনে বসাবো তোমায়। ভবিষ্যতে কথা রেখেছিল রাজকুমার। হলে কি হবে—ধুনুরির জাতস্বভাব ছুটবে কেমন ক'রে? রোজ মাঝরাতে যখন সবাই ঘুমে মগ্ন—সেই সময় উঠে যেত তুলো ধুনতে, লুকিয়ে তুলো ধুনে না এলে, চোখেপাতায় এক করতে পারত না ধুনুরিরাজা। এ হল তাই।

ধুনুরিরাজা লুকিয়ে যেত তবু, বিনয়কৃষ্ণ রাজা বেপরোয়া। সকলের সামনে নিজের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে কি কৃতিত্বই না দেখাচ্ছে! অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে উড়ে যাবে······অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

এদের বিষাক্ত নিশ্বাসে মানুষটা শেষ হয়ে গেল। চাষীদের অসুখে ওষুধ দিতে গেছে, পেটের ক্ষিদে মেটাতে খাবার দিতে গেছে, তাতেও কথা! আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলছে। নিজে সুহৃদ সাজছে, ওদের চোখে অন্য শরিকদের দুশমন করে তুলেছে। কত বড় ধ'ড়িবাজ! আর দেবে নাই বা কেন? পরের ধনে পোদ্দারি! নিজের কানাকড়িও নয়। নিজের হলে মুরদ জানা যেত।

সারা শরীরের রক্ত চনচন করে ওঠে সুরমার। এদের মধ্যে কেউ না কেউ খুনী। কে—কে? অস্ফুটে বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। নিজের কথার প্রতিধ্বনি নিজের কানেই শুনল আবার। বিনয়কৃষ্ণর উদ্দেশ্যে বলল, এত ভালবাসতে তুমি আমায়—আমার কোন কষ্ট হোক—এ তো চাওনি তুমি কখনো। তুমি কি দেখিয়ে দিতে পার না—কে খুনী? তুমি কি প্রতিশোধ নিতে পার না?

সুরমা রোজই বলে একথা। কই—কেউ তো শোনেনা! না শুনুক, সুরমার মন আবারো বলে, তোর ইচ্ছে পূরণ হবে। কেন এত নিরাশ হয়ে পড়েছিস! ঘোড়াটা এগিয়ে চলেছে ঝোপঝাড়ের দিকে। হতে পারে মনের ভুল, তবু এ ভুল ভালো লাগে সুরমার। কখনো মনে হয় বেঁচে থাকার মতো বিনয়কৃষ্ণ তার পেছনে বসে আছে, কখনো

মনে হয় পেছন থেকে নেমে গেল। সে একা। পেছনে বসে থাকার সময়, সব দুঃখ সব শোক কোথায় হারিয়ে যায় নিমেষে। ক্ষণিকের জন্য হলেও, অতীতের সুখের দিনে সুরমা ফিরে যায় আবার।

ঝোপঝাড় পেরিয়ে এসেছে সুরমা। এলেও, একটু ফাঁকার পর ঘন জঙ্গল। চাঁদের আলো পৌঁছয়নি ওখানে। অন্ধকার। ঘোড়াটা অন্ধকারে মুখ ঢুকিয়েছে। বাকিটা আলোয় রয়েছে। হঠাৎ কার যেন দৌড়ে আসার পায়ের শব্দ শুনল। সুরমা ঘাড় ফেরাল। বজ্রকান্ত।

জানালা দিয়ে দেখেছে সুরমাকে। ঘরে থাকতে পারেনি। ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে রাস্তায়। সুরমাকে পাওয়ার উন্মত্ত নেশা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে আরো বিনয়কৃষ্ণকে না দেখে।

বজ্রকান্তর চোখে আনন্দের ঢেউ। সুরমা যেন একটা চাঁদের আলোর ঢেউ। ঘোড়া চলার তালে তালে উঠছিল নামছিল। মুগ্ধচোখে দেখেছে আর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে বজ্রকান্ত।

মনের সায়রেও খুশীর ঢেউ। কলমগাঁয়ের নৌকোবাইচ খেলার দৃশ্যটা ভেসে উঠছে। পনেরো বছর বয়সের কথা।

কালীপুজোর দিন।

মাঠ উপচে মেলা নেমেছে নদীর তীর অবধি। মেলায় বাউল-গানের মিষ্টি কলি ভেসে আসছে কানে—'সবার সাথে ডুব দে জলে, তুলবি মাণিক পরবি গলে'। একতারার তুং-তুংয়ের সঙ্গে ঘুঙুরের আওয়াজ উঠছে। নাচছে বাউলরা।

নদীতে ছোট ছোট নৌকো সার বেঁধে সাজানো। পেতল-কাঁসার পাতে নৌকোর চোখমুখ গয়না চকমক করে উঠছে। প্রতিযো-গীরা পুজোর মালা গলায় দিয়ে যে যার নৌকোয় উঠে বসছে। বজ্রকান্তও বসল। সে নির্ভয়, হারবে না বাইচ খেলায়। তার যে আসল শত্রু, সে নামেনি প্রতিযোগিতায়। তার ওপর সদয় হয়ে নয়, বাধ্য হয়ে। বেহুঁশ জ্বর।

আসার আগে আকাশ-ছোঁয়া কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রকান্ত

প্রার্থনা করেছে একান্ত মনে। *বিনয়কৃষ্ণর জ্বরটা যেন আরো বাড়ে। উত্থানশক্তি-রহিত হয়ে থাকে যেন, যেমন দেখে এসেছে সে।*

কালীমূর্তির নীচের বাঁ হাতে ধরা অসুরমুণ্ডুতে বিনয়কৃষ্ণর মুণ্ডু দেখেছে। চুলের মুঠি ধরে রয়েছে মা-কালী। ওকেও ধরে রাখবে এইভাবে। আসতে দেবে না। বাইচ খেলা শুরু হল।

নিজের নৌকোয় ফুলের মালা জড়ানো দাঁড় বাইছে বজ্রকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে। সকলে একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে। 'ঘরে আইলা সোনার চান্দ, কলসী পাইলা দান'। অন্য নৌকোর ছেলেরাও ওদের গানের প্রতিধ্বনি তুলছে।

নদীর জলে ঢেউ তুলে, জল কেটে কেটে শোঁ-শোঁ করে নৌকো ছুটছে। সবার আগেই ছুটে চলল বজ্রকান্তদের নৌকো। ছেলেদের উল্লাসে-চিৎকারে নদী-ঘাট-মাঠ একাকার হয়ে গেছে।

তীরে এসে ভিড়ল বজ্রকান্তর নৌকো। সব নৌকোই একের পর এক পেছনে। বাইচ খেলায় প্রথম নৌকোর মাথার মণি বজ্রকান্ত ডাঙায় পা দিতেই গুণ-মুগ্ধরা ঘাড়ে তুলে নাচতে শুরু করেছে। চতুর্দিক থেকে ছেলেরা নিজেদের গলার মালা খুলে খুলে ছুঁড়ে দিয়েছে। রজনীগন্ধার মালায় মালায় গোটা দেহটা ঢাকা পড়ে গেছে।

বজ্রকান্তর মনে হয়েছে, শুধু বিজয়ী নয় সে আজ, সে বিনয়কৃষ্ণর বিজয়মাল্য নিয়ে নিজের গলায় পরেছে।

ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়ল বজ্রকান্ত। বাতাসে সেদিনকার সেই রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। তার আর কোন কাঁটা নেই। নেই বিনয়কৃষ্ণ। সুরমাকে নিয়ে চলে যাবে, যেখানে দু'চোখ যায়। উত্তেজনায় আনন্দে আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। কার যেন পায়ের শব্দ, কার যেন নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। চনমন করে তাকাল চারদিকে। কেউ নেই। নিজের পায়ের শব্দ নিজের নিশ্বাস পড়াই শুনেছে।

এবারে আস্তে আস্তে চলছে। ছুটে চলার প্রয়োজন নেই।

সুরমার কাছাকাছি এসে গেছে। ঘোড়া দাঁড়িয়ে। আর এগোয়নি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে সুরমা।

এগোতে আর হল-না বজ্রকান্তকে। সুরমার পাশে এসে দাঁড়াল বিনয়কৃষ্ণ। তার দিকেই আসছে। পালাতে চেষ্টা করল। মাটিতে দুপা আটকে গেছে। তুলতে পারছেনা। ঘেমে উঠছে। চিৎকার করে সকলকে ডাকতে ইচ্ছে করছে, বাঁচাও আমাকে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছেনা। গলাটা কে যেন চেপে ধরেছে।

শিউরে উঠল বজ্রকান্ত। তার ধুতি-পাঞ্জাবি লাল টকটকে রক্তে ভিজে গেছে। এ যে বিনয়কৃষ্ণর রক্ত। কি গরম!

ধুমকুচাষীর বৌকে ওষুধ দিয়ে ফিরছিল বিনয়কৃষ্ণ। জঙ্গলের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বজ্রকান্ত। ও জায়গাটায় লোকজন বড় একটা চলে না দিনে। সন্ধ্যে থেকে রাতভোর নিস্তব্ধ নির্জন। লোকে বলে, ভূতের রাজ্য ওখানে।

এই ভূতের রাজ্যে গোপনে কাজ সাঙ্গ করতে চেয়েছে বজ্রকান্ত। কেউ টের পাবে না কখনো কোনদিন। কেউ সন্দেহও করবে না তাকে কোন সময়ের জন্য।

ভূতপ্রেতের ভয় নেই বিনয়কৃষ্ণর। বজ্রকান্তরও নেই। বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস করে না যেমন, বজ্রকান্তও করে না। বজ্রকান্ত মনে করে, মানুষের মনের ভূতই ভয় দেখাই বেশী।

সুরমা বলেছে, ভূত থাকুক না থাকুক—সেটা কথা নয়। জায়গাটা আমার ভালো লাগে না। নাই বা গেলে, তোমার প্রায়ই সন্ধ্যে হয়।

বুকে ঘুষি মেরে, আড়চোখে বজ্রকান্তর দিকে চেয়ে, ব্যাঙ্গের সুরে বিনয়কৃষ্ণ বলেছে, এ বান্দাকে ভূতও ভয় করে জানবে। দেখলে পথ ছেড়ে দেয়। ভয়ের কোন কারণ নেই তোমার। তোমার সিঁদুর-লোহা অক্ষয় থাকবে গো।

ওদের দু'জনের হাসি-কথা আনন্দ-দম্ভ একদম সহ্য করতে পারছিলনা বজ্রকান্ত কদিন ধরে। ও বাড়ির বিষয় হাতছাড়া—কারণ, বিনয়কৃষ্ণ। জ্যাঠামশাই আর জেঠিমার ভালোবাসা হাতছাড়া—

কারণ, বিনয়কৃষ্ণ। বিষয় জ্যাঠা-জেঠির ভালোবাসা জাহান্নমে গেলেও পরোয়া করে না বজ্রকান্ত কিন্তু সুরমাকে পেল না, সুরমার ভালোবাসাও পেল না। মহাকারণ—বিনয়কৃষ্ণ।

বিনয়কৃষ্ণ না মরে গেলে তার বেঁচে থাকা মূল্যহীন। এসপার-ওসপার—ভাগ্য-পরীক্ষা করে দেখবে একবার সে। শেষ চেষ্টা। নয় সে থাকবে, নয় বিনয়কৃষ্ণ। এক পৃথিবীতে দুই সূর্য থাকতে পারে না কখনো। পারে না পারে না।

হিজলবনের পেছনে হেঁসো নিয়ে বজ্রকান্ত তৈরী হয়েই দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যের মুখে, বিনয়কৃষ্ণ ফিরছে তখন। বনের কাছ বরাবর আসতেই পেছন থেকে ঘাড় লক্ষ্য করে হেঁসো ছুঁড়ে মারল সজোরে। আর্তনাদ করে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল বিনয়কৃষ্ণ। ছুটে এলো বজ্রকান্ত। হেঁসোটা কুড়িয়ে নিয়ে কোপের পর কোপ মেরে চলল বিনয়কৃষ্ণর সর্বাঙ্গে। ওকে বাঁচতে দেওয়া হবে না। কিছুতেই না, কিছুতেই না।······

মরে গিয়েও মরেনি বিনয়কৃষ্ণ। সুরমার কাছে এলেই দেখতে পায় বজ্রকান্ত। নিজের ঘরের দরজায়ও দেখেছে। এখনো আসতে দেখছে।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। ভেতরের রক্ত জমাট হয়ে উঠছে, বজ্রকান্ত বুঝতে পারছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পড়ে গেল। সমস্ত দেহটা বরফের বড় বড় চাঁই দিয়ে কে যেন ঢেকে দিচ্ছে। সরাতে পারছে না। কি ঠাণ্ডা কি ভারী। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

আশ্চর্য হয়ে দেখল সুরমা, বজ্রকান্ত পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু ছটফট ক'রে উঠল। কাছে যাওয়ার আগেই স্থির হয়ে গেছে একদম। ওর নিষ্প্রাণ দেহটার পাশে বিনয়কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে।

দুই

মরা মানুষের মতো ভূপতিচরণের দু' চোখ ঘোলাটে। বয়সের ভারে বেশ কুঁজো হয়ে গেছেন। লোল চামড়ার কাঁপা হাতে লাঠি ঠক ঠক করে সেই ঘরখানায় আমায় নিয়ে এলেন। কুসুমিকার থাকার ঘর, গানের ঘর।

ঘরখানার বিভিন্ন জায়গায় বালি খসা। দু' একখানা নোনাধরা ইটও উঁকি মারছে। এমনিতেই বাড়িটার জীর্ণ দশা। হলুদ রঙের 'হ' চিহ্নও নেই। এটা বাইরে। ঘরের ভেতরে সাদা রঙ কালো। কোন্ কালে যে সাদা ছিল বোঝার উপায় নেই।

আমাকে নিয়ে ভাঙা জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন উনি।

আকাশ-মাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সেই জলা-ভূমি। উঁচু উঁচু ঘাসে ঢাকা। দেখে মনে হয় না মরণ-ফাঁদ পাতা রয়েছে ওর তলায়। ওই ঘাস মাড়িয়ে ওর ওপর দিয়েই ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সত্যিই কি আকর্ষণ!

এ পাড়ে সরোজ আসে। পেরুতে গিয়ে পেরুতে পারে না। বসে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে দেখতে পায় কুসুমিকা আসছে, কুসুমিকা বারণ করছে তাকে এক পা এগোতে।···

এখান দিয়ে দিনের বেলায়ই বড় একটা যায় না কেউ। পথ-মাঠ খাঁ-খাঁ করে। কারণ জানে সরোজ, তবুও কেন সে পা বাড়াল তা নিজেও বুঝতে পারছে না এখন।

সন্ধ্যে হতে না হতেই চতুর্দিক অন্ধকারে ডুবে গেছে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। কৃষ্ণপক্ষ হয়েই আরো মুশকিল বাধিয়েছে। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এগুতে চেষ্টা করছে সরোজ। পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে। ঠোক্কর খেলেও চলতে হচ্ছে তাকে। চলতে হবেও।

ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে কার পায়ের শব্দ শুনছে যেন। শব্দটা আসছে পেছন থেকে। পেছু ফিরে তাকাল। একজন নয়, দুজন আসছে পাশাপাশি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। আবছা আবছা। মনে হয় শক্ত সমর্থ যুবক ওরা। চলার গতি অতি দ্রুত।

ওরা ঠিক কাছে এলো না, পাশ কাটিয়েও গেল না। খানিক তফাতে মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল। অনেক আগে চলেছে ওরা। সরোজের মনে হচ্ছে, তার পাশে পাশেও কে যেন চলছে। বুঝতে পারছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা কেমন হয়ে উঠল। চারিদিক থমথমে, বাতাস ভারী। সরোজের ভেতর একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি।

আগের লোক দুটির হয়তো তারই মতো অস্বস্তি, হনহন করে হাঁটছে তাই, কোনরকমে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে বাঁচে। সরোজ সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলল, মশাইরা একটু থেমে চলুন! আপনাদের নাগাল পাচ্ছি না আমি, সঙ্গে যাবো।

মনে হল, ওরা থমকালো। কিন্তু পেছু ফিরে দেখল না। কোন উত্তরও দিল না। ফাঁকা জায়গায় সরোজের নিজের কথা নিজের কানে এসেই বাজল শ্রেফ। কেমন আশ্চর্য মানুষ ওরা। যাক, ডাক শুনে যে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে—এটাই যথেষ্ট।

যত জোরে সম্ভব, পা চালিয়ে চলতে শুরু করল। সরোজের পা ফেলার সঙ্গে ওরাও এগুতে আরম্ভ করে দিল। আবার সেই বাতাসের বেগে চলা। পাল্লা দিয়ে সরোজ পেরে উঠবে না। দৌড়ানোর মত চলছে। এর চেয়ে আর বেশী ক্ষমতা নেই তার। যেমন চলছে, তেমনিই চলুক। দূর থেকে, ওদের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুসরণ করলেই পথ পেয়ে যাবে ঠিক।

ওদের অনুসরণেও প্রতি পদে পদে বাধা এসে উপস্থিত হতে লাগল। পাশে যে অদৃশ্য পায়ের শব্দ শুনছে, সেই বাধা। এ পায়ের শব্দ কখনো সামনে থেকে আসতে লাগল, কে যেন এগিয়ে আসছে সামনাসামনি। দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। পাকেপ্রকারে ওদের দুজনের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে হচ্ছে।

একটা জায়গায় গিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এগোয়ও না আর, পেছোয়ও না আর। কি হল কে জানে, কি দেখল ওরা কে জানে। সরোজ চিৎকার করে বলে উঠল, মশাইরা দাঁড়ালেন কেন? এবারেও নিজের কথা ফিরে শোনা ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। ওদেব কাছ থেকে ফিরে এলো না কোন জবাব।

সরোজ অবাক হয়ে গেল লোক দুটিব অদ্ভুত আচবণে। সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। মুখে কথা বললে, কি এমন অশুদ্ধ হয়ে যাবে মহাভারত ওদের। মনে মনে ভাবল, দাঁড়িয়ে আছে যখন, নড়নচড়ন নেই, গিয়ে ঠিক ধরা যাবে, দেখা যাক না কেমনতর লোক।

কেন এসেছে, কোথায় এসেছে, কোথায় যাচ্ছিল, সবোজের মাথা থেকে উবে গেল সমস্ত। মানুষ দুটোকে দেখার জন্য একটা নেশা পেয়ে বসল কেবল।

মাঘের শেষাশেষি। ঠাণ্ডা বাতাসে করাতেব ধার। হাড়পাঁজরা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার দাখিল। এমন অবস্থায়ও চলার পরিশ্রমে ঘেমে উঠেছে সরোজ। হাঁপাচ্ছে। নিজের ওপর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের দিকে দৌড়চ্ছে।

ঝিঁঝির ডাক কমে আসছে। বন্ধ হয়ে গেল। এদিকটায় একেবারে গাছপালা শূন্য। শুধু কাদা আর কাদা। ঝড় জল নেই, কাদা হল কেমন করে। জুতো ডুবে যাচ্ছে। কাদায় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছে সরোজ। লোক দুটি একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। ভুল করে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, লোক দুটির দিক থেকে কে যেন আসছে এদিকে। স্ত্রীলোক। চোখ বড় বড় করে তাকাল। বিস্ময় বিমূঢ়। কুসুমিকা। ছুটতে ছুটতে আসছে। কুঁচনো শাড়ী ঘুরিয়ে পরা। মাথায় ওড়না। মুখ ঢাকা। হাতের ইশারায় আরো পেছনে সবে যেতে বলছে। এগুতে বারণ করছে।

কাদা ভেঙে পেছনে সবে এলো সরোজ। শক্ত মাটির ওপর এসে দাঁড়াল। কুসুমিকা আসছে। এবারে আর ছুটতে ছুটতে নয়, খুব আস্তে আস্তে। ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে নিয়ে আসছে অতি কষ্টে। সরোজের বুকের ভেতব মোচড় দিয়ে উঠছে। ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে নিয়ে আসে। ওঠার চেষ্টা করলেই, আবার হাতের ইশারা। যেমন বসে আছো, তেমনি থাকো, উঠতে চেষ্টা করবে না মোটে। আমি তো যাচ্ছিই।

সেদিনও এসেছিল সরোজ। মেঘমেদুর শ্রাবণের সন্ধ্যায়। কিন্তু ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়ল। যেমন মুষলধারে বৃষ্টি তেমনি শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইছে। জনপ্রাণী নেই স্টেশনে। অমলের বাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাঠাবে বলেছিল, লোক পাঠাবে বলেছিল। কিচ্ছু না। না গাড়ি, না লোক।

সরোজ যেদিকেই চোখ ফেরাচ্ছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক, আকাশ মাটি জুড়ে আঁকাবাঁকা নীল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। জলে থৈ থৈ করছে রাস্তা। রাস্তা-পুকুর একাকার। বোঝার উপায় নেই কোথা দিয়ে যাবে।

স্টেশন-মাস্টারের ঘরে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো। ঝড়ের দাপটে তাও নিভু নিভু। ওই ঘরেই আশ্রয় সরোজদের। সরোজ আর বন্ধু নীহারের। নীহারের মুখ গম্ভীর, কপালে বিরক্তির রেখা, চোখে রোষ। তারায় আগুন ছিটকোচ্ছে। মনে মনে গজরাচ্ছে। না এলেই ছিল ভালো। পাড়াগ্রামে এসে অঘোরে প্রাণটা যাবে দেখছি। আসবে না, নাছোড়বান্দা সরোজ। হতভাগা কোথাকার।

অমলের ওপর দরদ উথলে উঠল।—না গেলে কি ভাববে রে। মেসের এত ছেলের মধ্যে তুই আর আমিই তো ওর প্রাণের বন্ধু। এক তো বরযাত্রী যাওয়া হল না। বৌভাতে না গেলে, মেসে এসে একতিল তিষ্ঠতে পারবে ও আর? ছেলেরা পেছু লেগে জ্বালিয়ে মারবে না ওকে। কি হে, ঝড় হোক, জল হোক —যাবেই ওরা—ওরা যে আমার প্রাণের বন্ধু—বড্ড, বড়াই করে গেলে—গেল ?

সরোজের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে নীহার। পারলে, চোখের আগুনে ভস্ম করে ফেলে। বিড়বিড় করে বলল, আপদের সঙ্গ ছাড়লে বাঁচে। এ যাত্রা কি করে বেঁচে ফিরবে—তা-ও জানে না। পরমায়ুর ইতি এখানে না টেনে, বিধাতা আরো বাড়িয়ে রেখে থাকে যদি, অশেষ ধন্যবাদ। করুণাময়ের করুণা-কীর্তন ক'রে বেড়াবে সে, যতদিন ধড়ে প্রাণ থাকবে। শেষনিশ্বাস পড়ার আগে পর্যন্ত।

ঝড়ের দৌরাত্ম্যে মড়মড় শব্দে অশথ গাছের পাতা-ঝরা শুকনো ডালটা ভেঙে পড়ে গেল। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল নারকেল গাছের মাথায়। গাছটা এতক্ষণ ধরে একবার মাটিতে নুইয়ে পড়ছিল, একবার মাথা তুলছিল আকাশের দিকে। মাথাটা জ্বলে খাক হয়ে গেল। এত বৃষ্টি এত ঠাণ্ডা বাতাস, তবু নীহারের মাথার জ্বলুনি থামছে না। মেসে ফিরুক একবার, তারপর সরোজকে দেখিয়ে দেবে—সে কি রকম ছেলে। হাড়ে হাড়ে টের পাবে তখন।

দরজার ফাঁক দিয়ে একবার করে বাইরে মুখ বাড়াচ্ছে সরোজ—অমল কাউকে ওদের খোঁজে পাঠাল কিনা দেখছে। আবার তখুনি বৃষ্টির ঝাপটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য, মুখ ঢুকিয়ে কপাট বন্ধ করে দিচ্ছে। অপরাধী মুখে চেয়ে দেখছে মাঝে মাঝে নীহারের দিকে।

দাঁতে দাঁত ঘষছে নীহার। গালের হাড় দু'টো উঁচু নিচু হচ্ছে থেকে থেকে। মরণ আর কি—ভালো মানুষ সাজা হচ্ছে! বাইরে মাথা বাড়াচ্ছিস, নারকেল গাছটার দশা দেখেও আক্কেল হল না। ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থেকে থাকে। মাথায় বাজ পড়লে কি আর প্রাণে বাঁচবি?

সব কথাই নীহারের মনে মনে। মুখ খোলেনি একদম। মুখ খুলল এবার, না খুলে পাল না।—বলি এই সরোজ, হচ্ছেটা কি? আমায় আরো ফ্যাসাদে না ফেললে কি শান্তি নেই তোর? এবারে মর, মরে আমার মুখ পোড়া। লোকে বলুক, নীহারটা এমন অপয়া,

সরোজের সঙ্গে গিয়ে প্রাণ খোয়াল। নাইবা আর এ বদনামটা দিলি আমার। দরজায় খিল দিয়ে, চুপ করে বস দিকিনি। বেঞ্চিতে পাশে এসে বসল সরোজ। স্টেশন-মাস্টার মিটি মিটি হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, অত ছটফট করছেন কেন? বৃষ্টি না থামে, রাতভোর এখানে থাকুন। কোথায় যাবেন? সকালে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দোব' খন। বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বেরুনোর কি দরকার মশাই? আগে এসেছেন কোনদিন? না। মৃদুস্বরে বলল সরোজ।

তাহলে তো আরো ভালো। হলুদবাড়ির নজরে পড়লে তো আর রক্ষে নেই। হলুদবাড়ি!

স্টেশন-মাস্টার সচেতন হয়ে উঠল। নিজের অগোচরে মুখ ফসকে যে কথা বেরিয়ে গেছে, তাকে ঘোরানোর চেষ্টা করল। বলল, না, না। ওসব কিচ্ছু না। আমি এমনি একটু রগড় করছিলুম। বৃষ্টি-বাদলের দিন। রাতও বাড়ছে, বসে বসে কি আর করা যায় বলুন? চেয়ারে গা এলিয়ে দিল স্টেশন-মাস্টার। বড় করে হাই তুলল একটা। দু'বার টুস্‌কি দিল। মুখে বলল, জীব জীব।

এত রাগেও নীহারের হাসি পেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। তবু নিজের দীর্ঘজীবন কামনা নিজেই করছেন।

নীহারের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে সরোজ। সরোজ জানে, কোন কিছুর গভীরে প্রবেশ করে না নীহার। হালকা মনের মানুষ ও। একটুতেই রুষ্ট। একটুতেই তুষ্ট। হলুদবাড়ির কথাটা নীহারের মনেই নেই। কিন্তু সরোজের আছে। স্টেশন-মাস্টার বলতে গিয়েও বলল না। চেপে গেল। যাক গে, অমলের কাছে খবর নেবে। নামটা শোনার পর, জানার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে। শেষের বিশেষণটা যা যোগ করল স্টেশন-মাস্টার—নজরে পড়লে তো আর রক্ষে নেই—এতেই বাড়িটা দেখার আকর্ষণ বেড়ে উঠেছে সরোজের।

সরোজের মনে হচ্ছে, হলুদবাড়ি এমনি কোন নিছক রসিকতা নয়। স্টেশন-মাস্টার জানে সমস্ত, বলবে না। 'হলুদবাড়ি' কথাটা

সরোজের ভেতরে তোলপাড় করতে লাগল। বসে থাকতে পারছে না। অস্থিরতা বাড়ছে। উঠল। দরজা খুলে দেখল বৃষ্টি কমেছে, থামে নি একদম। তা হোক, এতে যাওয়া যায়। একটা গাড়ি পেলেই হল। বাতাসেরও তেমন দাপট নেই আর। অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে সবদিক থেকেই আশার আলো পাচ্ছে একটু। আকাশ বাতাস অনুকূল। একখানা রিক্সাও এগিয়ে আসছে স্টেশনের দিকে। সাইকেল রিক্সা।

মুখ ফিরিয়ে বলল নীহারকে, বেরিয়ে আয় শীগগির। দুর্যোগে ঘোড়ার গাড়ি পাঠাতে পারেনি অমল আমাদের দু'জনের জন্য, রিক্সা পাঠিয়েছে বোধ হয়।

বলাও যা, কাজও তা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরোজ। বসে থাকতে ইচ্ছে থাকলেও বসা গেল না আর। সরোজের জন্য উঠে পড়তে হ'ল নীহারকে।···প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে দু'জনে।

দু'হাত নেড়ে দুলিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে রিক্সা ডাকছে সরোজ। এসবে চোখ নেই রিক্সাঅলার। ডাকাডাকিতেও কান নেই! চোখের সামনে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। নীহার বলল, কিরে—অমল পাঠিয়েছে না? তার ভারী মাথা ব্যথা।

সরোজ চুপ করে রইল। কোন কথা কইল না।

আর একটা রিক্সা আসছে। জোরে নয়। গদাইলশকরী চালে। মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আসছে। সরোজ ডাকল না। একদৃষ্টে দেখছে শুধু।

প্ল্যাটফরমের ধারে রিক্সা থামল।

রিক্সাঅলা চেয়ে চেয়ে দেখছে দু'জনকে।

নীহার বলল, এটা বোধ হয় অমলদের পাঠানো। রিক্সাঅলা খুঁজছে তাদের।

দু'জনে রিক্সায় চাপল। কে, কোথায় যাবে—একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না রিক্সাঅলা। সওয়ারী উঠতেই, চালাতে শুরু করে দিল।

সরোজ-নীহারও কিচ্ছু বলল না। অমলের রিক্সাঅলা যখন, সবই তো জানে। বলার কি-ইবা আছে।

জল জমা রাস্তায় জল কাটতে কাটতে রিক্সা চলছে। কালিকাপুরের অনেক ভেতরে এসে গেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, বাড়ছে আবার। ঝমঝম আওয়াজ। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। অস্পষ্ট।

বাড়িটা অন্ধকারপুরী মনে হল। বৌভাতের বাড়ি নয় ওটা এ বিষয়ে নিশ্চিত। কোনদিক দিয়ে কোন আলোর রেখা বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না বাইরে। গাঁয়ের বাড়ি হলেও হ্যাজাকের আলো তো জ্বলবেই ভেতরে।

সবে রাত নটা। এর মধ্যে নেমন্তন্ন বাড়ি কি ঘুমিয়ে পড়ে? কুটুমস্বজন গানবাজনা হৈহুল্লোড়ে তো জমজমাট থাকবে সারা রাত।

যমদূতের মতো রিক্সাঅলাটা তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল রিক্সা থেকে। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। দুজনের মুখে কি দেখল, কি এমন পেল, কি এমন না পেল কে জানে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। রিক্সা পড়ে রইল, আর ফিরেও তাকাল না একবারের জন্য। ডাকাডাকি হাঁকাহাকিই সার হল দুজনের। রিক্সাঅলাকে মনে হল, রহস্যময় মানুষ। নিজের খপ্পরে এনে ফেলেছে হয়তো। অমলের পাঠানো হলে এভাবে ছেড়ে যেত না এ অবস্থায়। বাড়ি পৌঁছে দিত। দিল না! মনে দুরভিসন্ধি আছে নিশ্চয়। দুর্যোগের রাতে শিকার ধরে নিয়ে আসে। দলবল নিয়ে এসে পড়বে বোধ হয় এখুনি।

বোতাম আংটি ঘড়ি দেখে রেখেছে বিদ্যুতের আলোয়। আর দেরী নয়, বসে থাকা একদণ্ড উচিত নয়। যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে অন্তত। কাছাকাছি অন্য কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না আর।

সরোজ রিক্সা থেকে নেমে পড়ল। হাত ধরে জোর করে টেনে নামাল নীহারকে। সরোজ জানে নীহার মুখে শের মারলেও মনের

দিক দিয়ে ভীষণ ভীতু! ও যে ভয় পেয়ে গেছে, মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে। মুখে কথা নেই। জবুথবু হয়ে গেছে।

বাড়িটা লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে সরোজ, নীহারের হাত ছাড়েনি একদম। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আছে।

বাড়ির দোরগোড়ায় এসে নীহারের হাত ছেড়ে দিতেই ধড়াস করে পড়ে গেল নীহার। বেঁহুশ। দুমদুম করে দরজায় ঘুষি মারছে সরোজ। ভেতর থেকে দরজায় খিল আঁটা।

খটাস করে পাশের জানালাটা কে খুলল। গম্ভীর গলায় বলল, কে? ধড়ে প্রাণ এলো, মনে সাহস এলো সরোজের। উঁকি মেরে বলল, আমরা। কে আপনারা?

লণ্ঠনের আলো খোলা জানালা দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ছে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল সরোজ। বলল, অমলদের বাড়িতে নেমন্তন্ন এসেছি। বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে একটু খুলুন না।

ভেতরের মানুষ লণ্ঠনের আলোয় সরোজকে দেখে নিল ভালো করে একবার। তারপর লণ্ঠন হাতে নিয়ে খড়মের খটখট আওয়াজ তুলে, এলো সদর দরজায়। কপাট খুলেই আঁতকে উঠল নীহারকে দেখে।—এ কি খুন নাকি?

না, অজ্ঞান হয়ে গেছে ভয়ে।

ভূপতিচরণ মেঝেয় লণ্ঠন নামিয়ে রাখল। সরোজ আর ভূপতিচরণ দুজনে মিলে নীহারকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এলো। ভূপতিচরণ শুইয়ে দিল তক্তপোষে পাতা বিছানার ওপর। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দৌড়ে। সদর দরজায় ভাল করে খিল ছিটকিনি এঁটে ঘরে ফিরল আবার।

মাথায় মুখে চোখে জল ছিটতে ছিটতে নীহারের দুচোখ খুলল। উঠে বসল আস্তে আস্তে! ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে, একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে নিল বুক ভরে।

আশ্বাসবাণী শোনাল ভূপতিচরণ নীহারকে। এখানে কোন ভয়

নেই আপনার। নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। বলেই প্রৌঢ় আনমনা হয়ে পড়ল একটু। কি যেন কি ভাবল। নিমেষে মুখের সব রক্ত সরে গেছে। সাদা ফ্যাকাশে। ওপরের বারান্দায় তোড়া পরে চলছে কে। ঝুমঝুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে নিচে থেকে। থামল আওয়াজ। ভূপতিচরণের মুখের এ ভাবটা কেটে গেল।

ঢোঁক গিলে বলল ভূপতিচরণ, অমলরা তো বাঁড়ুজ্যেপাড়ার নাম করা ঘর। কে না চেনে। খুঁজে পেতে দেরী হবে না আপনাদের। তবে ঘোরা পথে এসে পড়েছেন, রাত্তিরে মহাঅসুবিধে। তাব ওপর ঝড়বৃষ্টির রাত। আজ পৌঁছুনো মুশকিল। কাল ভোরে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো'খন।

কেমন করে হয়? আজ বৌভাত, আজ না গিয়ে, কাল করবোটা কি? আজই এখুনি পাঠিয়ে দিন আমাদের। সরোজের গলার স্বরে অস্থির উৎকণ্ঠা।

ঝড়বৃষ্টি তাণ্ডব শুরু হয়েছে বাইরে।

জানালা খুলে দেখল ভূপতিচবণ। বলল, অসম্ভব। দেখছেন তো অবস্থাটা। গরীবের যা খুদকুঁড়ো আছে, সেবায় লাগলে ধন্য মনে করবো।

কি বলছেন আপনি? আপনার মতো মহৎ কে আছে বলুন তো? চেনা নেই জানা নেই—রাতে আশ্রয় দিয়েছেন দুজনকে বাড়িতে। কে দেয়? নীহার বিনয়ের সুরে বলল। বলল, আমি যাচ্ছি না, অমলকে পরে বুঝিয়ে বললেই হবে। ও এত অবুঝ নয়, সমস্ত ঘটনা জানলে রাগ করবে না।

সারোজের দিকে ফিরে বলল, সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি। গোঁয়াতুর্মি করে এসে, যা হল ভালো রকম মালুম হয়েছে তো। আর কেন? এবার স্থির হ'। ভদ্রলোক যা বলছেন, শোন! আর না না করিস না।

তোড়ার মিষ্টি আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নামছে এবার। উৎকর্ণ হয়ে

শুনছে সরোজ, শুনছে নীহার। চঞ্চল হয়ে উঠল ভূপতিচরণ। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না আর। ভেতরে চলে গেল। তোড়ার আওয়াজ নামতে নামতে থেমে গেল। নিচের দিকে নামল না আর। কিছুক্ষণ থেমেই রইল। আবার শোনা যাচ্ছে। ওপর দিকে উঠছে বোধ হয়। উঠল। মিলিয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে না আর।

খানিক বাদে এলো ভূপতিচরণ। দুহাতে দুটি কাঁসার থালা। আলু ছেঁচকি আর লুচি। থালায় একটা করে ছোট বাটিতে আখের গুড়। বছর বারোর বাচ্চা চাকরের ঘুমের ঘোর কাটে নি। দু'চোখ ঢুলুঢুলু। দু'হাতে জলের গেলাস, কাঁধে দু'টো আসন। উলে বোনা কার্পেটের। একটাতে ময়ূর পেখম খুলে নাচছে, আর একটাতে দু'টি হাঁস পদ্মফুলের পাশ দিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটছে পুকুরে। কি রং ফলানো। শিল্পীর চোখ আছে বলতে হয়। দেখলে সত্যি মনে হয়। চোখ জুড়িয়ে যায়।

আসন পেতে সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াল দু'জনকে ভূপতি-চরণ। বলল, পেট ভরল না—ঘরে যা ছিল—

এ তো রাজার খানা মশাই। কি এমন খাই আমরা মেসে? যা ছিরি। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে নাড়ীভুঁড়ি পাক দিয়ে।

সরোজের কথা শুনে হেসে উঠল ভূপতিচরণ।

ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজছে ঝমর-ঝমর। একখানা গাড়ি আসছে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারার সপাং-সপাং আওয়াজ।

সরোজ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে জানালায় এলো। গাড়িটা স্টেশনের দিক থেকে আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরোজ। নিশ্চয় এটা অমলদেরই গাড়ি। কোন ভুল নয়। অমল নিজেই বলেছে তাকে, গ্রামে ওই একখানাই গাড়ি ওদের, আর কারো নেই।

রাস্তায় তিনজনে দাঁড়িয়ে।

ভূপতিচরণ পেছনে। মুখখানা বিবর্ণ। সামনে সরোজ আর নীহার। ওরাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকছে সইসকে।

আড়চোখে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল সইস।

আরো জোরে জোরে চাবুক মারতে লাগল ঘোড়ার পিঠে। গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন মুখ বাড়িয়েই সট করে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে। আশ্চর্য ব্যাপার। ঝড়ের বেগে চলে গেল গাড়ি।

তিনজনে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বলল ভূপতিচরণ, আর কেন—ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ুন। সকাল ছাড়া উপায় নেই।

ঘরের দু'ধারে দুটো তক্তপোষ পাতা। একটাতে ভূপতিচরণ শোয়। আর একটা এমনিই খালিই থাকে, আত্মীয়-স্বজন কেউ এসে পড়লে ব্যবহার হয়। ওদের দুজনকে দুটো ছেড়ে দিয়ে ভূপতিচরণ মেঝেয় শোয়ার জন্য বিছানা পাততে চাইল, রাজী হল না দুই বন্ধুতেই। একটাতেই হবে। বড় তক্তপোষ, দুজনের শোয়ার কোন অসুবিধে হবে না। মেসে তো একটা সরুফালির ওপর শুয়ে থাকে। একটু এপাশ-ওপাশ করবার উপায় নেই। প্রতিরাতেই পড়ে যাওয়ার ভয়। কোনদিন না ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে গিয়ে নাক-মুখ থেঁতো হয়ে যায়।

শোয়া মাত্র নাক ডাকতে শুরু করল নীহারের। ওর ওই রকমই অভ্যাস। কুম্ভকর্ণ। ভূপতিচরণেরও জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। সরোজের পোড়া চোখে ঘুম আসছে না। কেবল অমলের মুখখানা মনে পড়ছে। বড্ড জ্বালাচ্ছে। এত স্পর্শকাতর —যাওয়া হল না—জানালার রেলিং ধরে হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তার দিকে চেয়ে।

ভিজে হাওয়ায় মাটির সোঁদা গন্ধ। কিন্তু একটা মিষ্টি সুরের রেশ বয়ে নিয়ে আসছে। রেশ নয়, গান। কোন বাজনা নেই ·এক তানপুরার সুর ছাড়া। কোন পুরুষের গান নয় এ। নারীকণ্ঠ। পাপিয়া না কোয়েলিয়া—কার কণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করবে সরোজ—ভেবে পাচ্ছে না। এমন মধুর স্বর কি সত্যিসত্যিই কোন মেয়ের হয়—হতে পারে?

মায়ের গান শোনাবার শখ খুব। নিজেও গাইতে পারে ভালো।

বাবা মারা যাবার পর মা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে তাকে নিয়ে। ঘরে মন বসাতে পারতো না মোটে। যেখানে যখন গানের জলসা হয়েছে, গেছে। তাকে সঙ্গে নিয়েছে। এরকম গলা তো শোনে নি কোথাও। ঘুম পাড়ানো গলা। এ ঘুম নীহারের ঘুম নয়। এ ঘুম সুরের অতল তলে ডুবে যাওয়া, ডুবে থাকা। তন্ময়তা।

সন্তর্পণে বিছানায় উঠে বসল সরোজ। চৌকির মচমচ আওয়াজে ঘুম না ভেঙ্গে যায় কারো। শুনছে মন-কান এক করে। মনে হচ্ছে এই বাড়ির ওপরে কেউ গাইছে।—শাওন আইলন সঁখিয়া, না আইলন শ্যাম···।

এতদিন শুনে এসেছে সরোজ গানের বিষয় নিয়ে অনেক অবিশ্বাস্য কথা। এখন সেসব বিশ্বাস হচ্ছে। গানে বনের পশুও বশ মানে। হিংস্র হিংসা ভোলে, ক্রোধীর ক্রোধ নিভে যায়, লোভীর লোভ থাকে না। কামনাকাতর মানুষও ঈশ্বরের ভক্ত হয়ে ওঠে। গান দূরের মানুষকে কাছে টানে। সম-বয়সীর মন ভরে দেয় বিশুদ্ধ আনন্দে। দুঃখ-শোক কোথায় ভেসে যায়, ঠিকানা নেই।

সব ক'টি পাচ্ছে সরোজ এই একটি গলায়। এ গলার অসম্ভব সম্ভব করার ক্ষমতা রয়েছে।

ঠিক সময় ঠিক গান গাইছে গায়িকা। স্থানকাল ভুলেছে সরোজ গান শুনতে শুনতে। অচেনা জায়গা, অচেনা বাড়ি। সুরের রাজ্যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। নিজের অগোচরেই চৌকি থেকে নামল। দরজা অবধি এলো। লণ্ঠনের আলো নেভানো। কেরোসিন পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরময়। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি অত। উঁচু চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। চোর চোর বলে ভূপতিচরণ চিৎকার করে উঠল। নীহার উঠে পড়ল ধড়মড়িয়ে। মাথার তলা থেকে টর্চ বার করে জ্বেলেছে তখুনি ভূপতিচরণ।

সরোজের সুরের ধ্যান ভেঙেছে। আনন্দলোক থেকে অসুর-লোকে আছড়ে পড়েছে। সচেতন হতে লজ্জার একশেষ।

মেঝে থেকে ধরে তুলেছে ভূপতিচরণ। বলেছে, মাপ করবেন।

এমন অভ্যাসের দোষ—পাড়াগাঁয়ে থাকি তো—চোরের ভয়—চোরকে জেগে আছি জানান দেয়ার জন্য ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোর চোর করে উঠি মাঝে মাঝে।

নীহার আপাদমস্তক হাত বুলিয়ে দেখছে—কোথাও চোট-টোট লেগেছে কিনা। বলল, তেমন কিছু নয়। হাঁটুর নিচেটা একটু ছড়েছে যা।

টিনচার আছে এনে দেবো?

ফিরে তাকাল সরোজ। এই গলারই গান শুনছিল সে। কিন্তু বাঙালী বাড়িতে—রাজপুতানীর মতো ওড়না ঢাকা কেন তরুণীর মুখে। সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। বাঙালী ঢঙে গায়ে ব্লাউস, কুঁচনো শাড়ী ঘুরিয়ে পরা। গোলাপী জামা গোলাপী শাড়ী। ওড়নার রঙটা মিশমিশে কালো। মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাতে চুড়ি-বালা পায়ে তোড়া। ওড়নায় গলা ঢাকা। হার আছে কিনা বুঝতে পারা গেল না। বাঁহাতে লণ্ঠন ঝুলছে। ডানহাত সিঁড়ির রেলিংয়ে।

সরোজ চোখ নামালো। বলল, আমার জন্য আপনার সাধনায় বাধা পড়ল।

সরোজের দিকে একবার কুসুমিকার দিকে একবার অবাক চোখে দেখল ভূপতিচরণ। অমন স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানা মরার মতো হয়ে গেল। নিচুস্বরে বলল কুসুমিকাকে, ওপরে যাও। টিনচার আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

রাতের স্মৃতি সকালেও ভুলতে পারেনি সরোজ। নিজের মনে গুনগুন করে কুসুমিকারই সুর ভাঁজছে শুধু। কুসুমিকারই গান গাইছে।—শাওন আইলন। অমলের বাড়ি এসেও।

যে মানুষ অমলের বাড়ি আসবার জন্য এত উদগ্রীব—অমলের বাড়িতে যে সরোজ এসেছে—এ যেন সে মানুষ নয়।

সকাল হতেই সূর্য ওঠার আগে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে

অমলের বাড়িতে ভূপতিচরণ। কথা দিয়েছিল, কথা রেখেছে। আসবার সময় আবার আগের মতো অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হতে দেখেছে সরোজ। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে কুসুমিকা।

কি মনে করে ভূপতিচরণ ওপর দিকে তাকাল। সেই সঙ্গে সরোজও ভূপতিচরণকে অনুসরণ করল। রাতের সেই বেশবাসে দাঁড়িয়ে তরুণী। সরোজ তাকিয়ে আছে। নজর এড়াল না ভূপতিচরণের। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল ; আমার লোকটি দূর থেকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবে। আর দেরী হলে লোকটির অন্যকাজে যাওয়া মুশকিল হবে আবার।

মেয়েটি কে—পরিচয় দিল না ভূপতিচরণ। জিজ্ঞেস করাব সুযোগ দেয়নি রাত্তিরে। দিলনা এখনো। মাথা নিচু করে যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছে সরোজ। বন্ধুর হাবভাব কেমন কেমন লাগছে অমলের। আনন্দের ছোঁয়া নেই কথাবার্তায়। বৌ দেখতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে হল। সতেজ-সবল মানুষটা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে একেবারে। এখানে যে ওর ভালো লাগছে না, দেখলেই বোঝা যায়। নির্জনে একলা থাকতে চাইছে। অমলও যে কাছে আসুক গল্পগুজব করুক—যেটা মেসে হত—পছন্দ করছে না।

রাত্রে গাড়ি পাঠানো নিয়ে রাগ-অভিমান করলেও বা ঠিক মানুষটাকে পাওয়া যেত তবু। গাড়ি পাঠিয়েছে অমল। অবিশ্যি ঝড়জলের দরুন একটু দেরী হয়ে গেছে। সইসকে দুটো রাস্তারই খোঁজ করে দেখতে বলা হয়েছে। সোজাপথে যাবে ঘোরাপথে আসবে। অচেনা জায়গা ওদের, কোন্‌পথ ধরে বলা তো যায়না।

সইস এসে জানিয়েছে, কোন পথেই পায়নি ওদের। জানলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছে অমল। সরোজ বেপরোয়া দুর্দান্ত। ভয়ডর বলে কোন লেখা নেই ওর কুষ্ঠিতে। না করে মানুষের ভয় না করে ভূতের। নিজের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস। বলেছিল, ঝড়বৃষ্টি হোক না, ওসব কিচ্ছু করতে পারবে না। মনের জোরের কাছে সমস্ত তুচ্ছ। কথার মানুষ ও। ও এলো না কেন ?

নীহারের কথা ভাবে নি। ও না এলেও, না
ঘরকুনো গোছের।

সকালে সরোজ আসতে, সইসের মুখে আর ে
পাঠানো হয়েছিল ওদের মুখে ত্রাসের ঘনছা
ফিসফিসানি শুনে, হৃৎকম্প হয়েছিল অমলের। এ
ভূপতিচরণের সঙ্গে দেখেছিল! দাদাবাবুর বন্ধুরা দাদাবাবুর মতোই ভূপতিচরণকে জানবে নিশ্চয়। ওখানে যাবে কেন? ভূপতিচরণ খুনী, কুসুমিকা খুনী, এ গাঁয়ের কে না জানে। ওদের নিশ্বাস যেখানে পড়ে, সে বাতাস নিতেও ভয়। ঘোড়াটা পশু, সেও বোঝে। কিছুতেই বাড়ির কাছ দিয়ে যাবে না। কি চাবুকই না চালাতে হয়েছে —বাপ্‌স যাদের কথায় কান দেয়নি, দেখছে তারাই দাদাবাবুর বন্ধু।

ভূপতিচরণের বাড়ির ভেতরে খবরটা নীহারের মুখে শুনেছে।

কেন মবতে সরোজকে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিল অমল আসার জন্য? কুসুমিকার নাম করতেও ভয় পায় লোকে। ভূপতিচরণেরও নাম করতে। নামেরও নাকি এমন মোহ, লোকেব মনে কৌতূহল জাগায়। এমন আকর্ষণ ওদের কাছে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে। কেউ রুখতে পারবে না তাকে। বিধাতার বিধিলিপিও উল্টে দেয় ওবা, এত ক্ষমতা ধরে। এ ক্ষমতা দেবতার নয়, পিশাচের।

যে ভয়ে পালাও তুমি, সামনে সে ভয় আমি। এ ঠিক তাই হল। যাব জন্য বন্ধুব কাছে, কারো কাছে প্রকাশ করে না, করেনি আজ অবধি অমল—পাছে সাবধান করতে গিয়ে নিজেই না বিপদের মুখে ফেলে দেয় ওদের।

মুখে চাবি দিয়ে রেখেও পারা গেল না। সবচেয়ে আপসোসের বিষয়, যে বন্ধু তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সেই-ই ওদের কবলে পড়ে গেল! এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে অমলের! দু'টো ঘটনা জানে। ভূপতিচরণের কুসুমিকার মরণগহ্বর থেকে বেরুতে পারে নি তারা। দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে তাদের। সে কি ভয়ঙ্কব মৃত্যু!

অমলের

আসবা-, উঠল অমল।

দে-ুর ভাবগতিকে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। আর ফেলিল এদেশে রাখা উচিত হবে না সরোজকে। এদেশের মাটিতে বিষ ঢালছে কুসুমিকা। আকাশে-বাতাসে—সর্বত্র ওদের নিশ্বাসের বিষ ছড়াচ্ছে। সরোজকে এখুনি পাঠিয়ে দিতে হবে এখান থেকে। ভেবে সময় নষ্ট করলে,, সর্বনাশ চুপ করে বসে থাকবে না একটুও।

অফিসে মন বসে না সরোজের, মেসেও না। ভেতরটা হু-হু করে কেবল। অসীম শূন্যতা। বন্ধুবান্ধবদের মনে হয় দুশমন। এতদিন ভেবেছিল, ওরা তার মন বোঝে, ব্যথা বোঝে। এসমস্ত বুঝুক না বুঝুক অন্তত তাকে বোঝে। বিশ্বাসের ভিত ধসে পড়েছে। অমলই উঠিপড়ি লেগেছে তার সঙ্গে। তার মাসতুতো বোন পূর্ণিমার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না কিছুতেই।

সবোজ স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে গুড়ে বালি। বিয়ে যদি করতে হয় কুসুমিকাকেই করবো। জীবন থাকতে অন্য কাউকে নয়। ওব গলা আমায় পাগল করেছে। বাতের ঘুম কেড়েছে, অফিসের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ও ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না।

অন্যলোক হলে হেসে ফেলতো সরোজেব কথা শুনে। বলতো, একটা গান শুনে এত, এ ভাবটা টেকে কদিন দেখা যাক আগে। তারপর উত্তর যা দেবার দোব। প্রথম প্রথম আবেগ-উচ্ছ্বাসে অনেকে অনেক কিছুই বলে এমন বয়সে, শেষ রাখে ক'জন ?

অমল বলতে পারল না। অমল যে জানে। এই একই বুলি বেরিয়েছিল আগের দু'জনেরও মুখ দিয়ে। তারা অন্য বিয়ে করতে চায় নি কুসুমিকাকে ছেড়ে। সরোজের সিদ্ধান্ত শুনে খুব মুষড়ে পড়ল। মাথায় সর্পাঘাতে ওঝা তাগা বাঁধবে কোথা ?

তবু কুসুমিকার ওপর যাতে ঘেন্না আসে, যাতে বিতৃষ্ণা আসে, চেষ্টা করে চলল অমল। সরোজের মন ঘোরাতে পারলে, বেঁচে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয় !

যা জানে, যা শুনেছে কুসুমিকার সম্বন্ধে গুছিয়ে গুছিয়ে বলে

সরোজের কানভারী করে মোহমুক্ত করতে চাইল। বলার সময় বিবেকের দরজায় ধর্ণা দিয়েছে বিশবাব। বাড়ির শিক্ষা ছিল কারো সমালোচনা করতে হয়, সামনে করবে। আড়ালে কারো আলোচনা কারো নিন্দা করা শোভন নয়। যার সুশিক্ষা আছে, সে এরকম করে না কখনো।

নিজের বিবেকের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছে অমল। সব ক্ষেত্রে এক উপদেশ খাটে না। জায়গা বিশেষে মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেখানে একটা মানুষ খুন হতে চলেছে, সেখানে তাকে বাঁচানোই প্রধান ধর্ম, মরণেব মুখে ঠেলে দেয়া নয়। কুসুমিকা সম্বন্ধে বললে, এখানে দোষের নয়।

বলল, কুসুমিকা বেনারসের বাঈজী। ভালো মেয়ে নয় ও। বেনারস থেকেই ভূপতিচরণ নিয়ে আসে ওকে। ওর গান শুনে বুঝিস নি? কোন বাঙালী মেয়েকে গাইতে শুনেছিস?

না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল সরোজ।

একজনের স্ত্রী হয়ে থাকলে ওর ব্যবসা চলবে না। তাই যে ওর জন্য পাগল, তার সর্বস্ব নিয়েথুয়ে, লোক দিয়ে খুন করে ফেলে। ও রাক্ষুসী। বেনাবসে অনেক সাধুসন্তের আড্ডা। তাঁদেব কাছে মানুষ বশের কোন মন্ত্র পেয়ে থাকবে হয়তো, নয়তো এমন কোন জাত গুণিনের কাছে এমন কিছু শিখেছে, যে ক্রিযাটা গানের আগে করে নিয়ে গায়। যে শোনে সে কিন্নরী কণ্ঠ শোনে। মনে হয় ভূ-ভারতে কোন মানুষের এমনতর গলা শোনেনি সে। মোহিত হয়ে যায়। শয়নে-স্বপনে ওই গলাই কানে বাজে শুধু। ও গলা ছাড়া অন্য কারো কথা কানে যায় না। সে ভালোই হোক, মন্দই হোক। গানের গলা শুনতে শুনতে আত্মীয় স্বজন ভোলে। নিজের অস্তিত্ব ভোলে। বিস্মৃতির উজানে বয়ে যেতে থাকে। স্মৃতিতে থাকে কেবল একটি মাত্র বস্তু—মায়াবী-গলা, মানুষ-খেকো গলা!

নির্বাক মুখে বসে থেকেছে সরোজ। মুখে কোন প্রতিক্রিয়ার ছাপ ভেসে ওঠে নি। শুনল কি না শুনল, কিচ্ছু বোঝা গেল না।

তবে একবারের জন্যও প্রতিবাদ করেনি যখন, হয়তো ওষুধ ধরলেও ধরতে পারে।

অমলের ভুল ধারণা। ওষুধ ধরে নি। তার ওষুধ রুগীর মুখে পড়েনি, পড়েছে জলে। উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে, মেসের জানলায় যা-ও বা বসে থাকতো সরোজ চুপচাপ, অমলের বলাবলির ফলে, সে জায়গায় আর দেখা গেল না।

মেসসুদ্ধ লোকের চোখে ঘুমনিদ্রা নেই। গেল কোথা?

অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, যায়নি।

কুসুমিকাদের বাড়িতে এসেছে সরোজ। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, ঘরে নিয়ে এসে বসাতে গিয়ে, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছে ভূপতিচরণের। আয়নায় কুসুমিকা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে! চোখের ইশারায় কি বলল কে জানে, কুসুমিকা ওপরে উঠে গেল।

ঘরের দরজা ভেজানোর সময় উল্টোদিকে দেয়াল ঝোলানো আয়নাটা দেখল একবার ভূপতিচরণ। কুসুমিকা আসেনি আর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। আবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, বসুন না। দাঁড়িয়ে কেন? ভেবেছিলুম আর এ-মুখো হবেন না।

কেন? বরং না হওয়াটাই তো অকৃতজ্ঞতা। সে রাতে যা করেছেন– সহজে কি ভোলা যায়?

আচ্ছা, আমার আচার-ব্যবহারে কোন সন্দেহ আসে না আপনার মনে?

না।

না! ভূপতিচরণের গলার স্বরে বিস্ময়। মুখখানা বিষণ্ণকাতর হয়ে উঠল।

—এই প্রথম শুনলুম 'না'। আমাদের অনেক বদনাম। কারণও আছে। কিচ্ছু শোনেন নি?

কতক কতক শুনেছি।

তবুও এসেছেন?

হ্যাঁ। বিশ্বাস করিনি।

বিশ্বাস করুন। আমি আপনাকে বলছি, এ পথ মাড়ালে অমঙ্গল হতে পারে।

গুজবে আমি কান দিই না। লোকেরা এক হয়, রঙ চড়িয়ে বলে এক।

যা রটে, তার কিছুও বটে—এটা বিশ্বাস করেন তো?

কোন ব্যাপারে মিলে গেলেও, সব ব্যাপারে মেলে না।

মেলে, আমাদের ব্যাপারে মেলে। দুটো মানুষ গায়েবের কথা শোনেন নি।

গায়েব নয়, খুনের কথা শুনেছি।

হ্যাঁ, শুধু খুন নয়, গায়েবী খুন যাকে বলে, তাই। প্রায় সবই তো শুনেছেন দেখছি। আশ্চর্য মানুষ আপনি। বলিহারি দুঃসাহস।

আরো কি কি বলতে যাচ্ছিল, দরজায় টোকা মারার আওয়াজ শুনে বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দিল ভূপতিচরণ। রেকাবি আর জলের গেলাস হাতে কুসুমিকা। রোদ্দুরে এসেছেন ভদ্রলোক। কিচ্ছু নয়, গোটা চারেক মোয়া মাত্র এনেছে। জোর করে কেড়ে নেয়ার মতো কুসুমিকার হাত থেকে মোয়ার রেকাবি আর জলের গেলাস নিয়ে নিল ভূপতিচরণ নিজের হাতে। গম্ভীর স্বরে বলল, ওপরে যাও। কথাটা বলেই ফিরে তাকাল সরোজের দিকে। বাইরের লোকের সামনে এ ভাবটা প্রকাশ করে ফেলা ভালো হল না তার। মোলায়েম গলায় বলল, ভদ্রলোকের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে ফেল গে। এত বেলায় জল খেয়ে থাকতে পারবে কতক্ষণ। ভূপতিচরণের ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো আবার। বলল, কুসুমিকার জন্য যে দুটি যুবক প্রাণ হারাল, জানি না—এটা কুসুমিকার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ না অভিশাপ।

ভূপতিচরণ যা বলছে, কোন কথা সরোজের কানেই ঢুকছে না, নিজের কথা বলার জন্য উসখুস করছে। দরজার দিকে চোখ ফেরাচ্ছে বার বার। লক্ষ্য করছে ভূপতিচরণ। বকে বকে মুখের ফেনা উঠে গেলেও এ ছেলে বুঝবে না। নিয়তির টান কি একেই বলে। কথার মোড় ঘোরাল। বলল, আপনি কি কিছু বলতে এসেছেন ?

হ্যাঁ, আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। সেটার সমাধান করার জন্যই ছুটে আসা আরো। সহজ-সরল গলায় বলল সরোজ।—আমি যেটা ভাবছি, ঠিক কি না জেনে যাবো।

কৌতূহল বিস্ময় দুটোই একসঙ্গে উঁকি মারল ভূপতিচরণের চোখের তারায়। সরোজের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

সরোজ কোন দ্বিধাসংকোচ না রেখে বলে যাচ্ছে মুখস্থের মতো। একমনে শুনছে ভূপতিচরণ। শুনতে শুনতে দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠছে কখনো, কখনো সজল। শোনার আগে ভেবেছে, এর কি প্রশ্নের কি সমাধান ? অন্যদের মতো মামুলি ধরনেরই হবে।

না। মামুলি কথা বলে নি সরোজ। যেটা বলা উচিত ভেবে নিয়েছিল ভূপতিচরণ। কুস্মমিকার গানেব গলার জন্য ঘরনী করে নিয়ে যাবে—একথার ধার ঘেঁষেও যায় নি।

বলেছে, মামারা যখন কলকাতায় থাকত, সেও থাকতো মামার বাড়ি। চোদ্দ বছরের কিশোর, স্কুলে পড়ছে। ডালিমতলার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মন কান চলে যেত একটা বাড়ির দিকে। বই-পত্তর বগলে করেই সামনের বাড়ির লাল রকের ওপর বসে পড়ত। স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যেত অনেকদিন। দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে কতবার।

সামনের বাড়িতে গান গাইত কোন মেয়ে। কি মিষ্টি গলা। ওই বয়সে নেশা ধরত তার। রোজ শোনার জন্য মন ছটফট করেছে। গানের মেয়েকে কোনদিন চোখে দেখে নি। চোখে দেখে নি বলছে এই জন্য, বসে গাওয়া দেখতে পায় নি তো কোন মেয়েকে। গানের আওয়াজ আসত ভেতর থেকে। সময় সময় অনেক মেয়েকেই ও

বাড়ির ছাতে বারান্দায় দেখেছে দাঁড়িয়ে থাকতে, হাসাহাসি করতে। যে গান গায়, সে তাদের মধ্যে থাকত কিনা জানে না।

এক আধদিন শোনে নি, প্রায় বছর খানেক ধরে শুনেছে। গানের বাড়ির বসার রক আর সকালের দিকের ওই রাস্তাটা বড্ড আপনার হয়ে উঠেছিল।

মায়েব অসুখে দেশে বর্ধমানে যখন যেতে হয়েছে, তখন কি যে কষ্ট সেই জানে। ওখানে গিয়েও, স্বপ্নে গান শুনত যেন।

মাস চারেক বাদে কলকাতায় ফিবে দেখল, তার সব শেষ হয়ে গেছে! বাড়িটা অন্যে কিনেছে। যারা ছিল তারা নেই ও তল্লাটে। কোথায় কেউ জানে না। তবু ও রাস্তা ছাড়ে নি সরোজ। ও বাস্তায় যেত। ভাঙা বাড়িটা দেখত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ। তাবপর মনমবা হয়ে ফিরে যেত।

বহুদিন পর, প্রায় বারো তেরো বছর বাদে সেই পুবোনো স্মৃতি পেয়ে বসেছে তাকে। সে বাতে এ বাড়িতে যে গান শুনেছে, সেই থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে খালি—কি যেন পায় নি সে। কি যেন পেয়েছে বুঝি। না পাওয়াব ব্যথা আর পাওয়ার আনন্দ -- দুটো মিলেমিশে একটা নতুন অনুভূতি নেচে বেড়াচ্ছে তাব শিরা-উপশিরায়। সত্যি কি কিছু আছে এর মধ্যে? না হারিয়ে যাওয়া অতীতের শূন্য জায়গাটা একটা ভালো লাগা গানের বেশ ধবে কল্পনা ভরাট করে তুলতে চাইছে?

বিস্ময়ে ডুবে যাচ্ছে ভূপতিচরণ। কি উত্তর দেবে? বুকেব ভেতব অসম্ভব রকন গুড়গুড় করে উঠছে। মনের চোখে আবারো একটা মর্মান্তিক দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

কুসুমিকা গোপন করেনি ভূপতিচরণকে। সে রাতে সরোজকে দেখে তার যা মনে হয়েছে, সব নির্দ্বিধায় বলেছে। বলেছে বলে, সেই থেকে ভয়ও ধরেছে ভূপতিচরণের।

কুসুমিকা জানিয়েছে, আমার মন বলছে, নিশ্চয় ও সেই ছেলে। এতদিন যাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। একবারটির জন্যও

দেখতে ইচ্ছে করেছে। সম্ভব নয় জেনেও এত দিনে পৃথিবীতে আছে কিনা—এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্বেও দেখাব ইচ্ছেটা থিতিয়ে যায় নি একটুও। লোকের কাছে বললে, হেসে উড়িয়ে দেবে, পাগল ঠাওরাবে তাকে। তাই বলে নি কাউকে। মা যখন বেঁচে ছিল, মাকেও না।

সরোজ সেই ছেলে না হয়ে যায় না। বয়স বাড়লেও মুখের আদল, চাউনি—যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে।

পিসতুতো বোন পূর্ণিমা এসেছিল কদিন। পূর্ণিমা তাকে ছাত থেকে প্রথম দেখায়। সেদিন তাড়াতাড়ি গানটা শেষ করতে বলে বেখেছিল ও আগে থেকে। পূর্ণিমার কথা মতো কাজ করেছে কুসুমিকা। ছাতে উঠে দেখে ওরা, ও বাড়ির রকে বসে সরোজ। এ বাড়িব দিকে তাকিয়ে। মুখ দেখে মনে হয়, আবার গান শুনতে পাবার আশা।

ঠাট্টা করে বলছে পূর্ণিমা, শ্রোতা বটে। যেমন বাচ্চা গায়িকা তেমনি তার বাচ্চা শ্রোতা। কুসুমিকাব চেয়ে এক বছরের বড। বছব পনেরো। হলে কি হবে পঁচিশের মেয়েরাও ওর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশায় পেরে ওঠে না। কুসুমিকা প্রতি-উত্তব দিল না কোন। ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।

সেই থেকে রোজ একবার না দেখলে সে দিনটাই যেন বিফল মনে হত। কাটতে আর চায় না। কোনদিন ছাতে আলসের ঘুল-ঘুলি দিয়ে কোনদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোনদিন খড়খড়ির পাখি তুলে দেখেছে সরোজকে।

সরোজ যা বলল, মিলেছে। তবু চিন্তা করছে ভূপতিচবণ। 'হ্যাঁ' বলবে, না, 'না'? 'হ্যাঁ' বললে, আসবে ঘন ঘন। বসে বসে কুসুমিকার গান শুনবে। কুসুমিকাকে তো জানে ভূপতিচরণ। তার চোখের সামনে আর একটা ফুলের মতো ছেলে মায়ের কোল খালি কবে চলে যাক—এ আর সহ্য হয় না। সরোজকে বাঁচাতেই হবে কুসুমিকার দৃষ্টি থেকে। সরোজেব ধ্যান-জ্ঞান মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

'না' বলেও কি কুসুমিকার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারবে সরোজকে ? যে অবস্থায় এসে গেছে এখন, গান যখন কানে পৌঁছেছে, তখন অসম্ভব। ছেলেটার মুখখানা মায়ামাখানো। কুসুমিকার কি অখণ্ড পরমায়ু ? মৃত্যু নেই ! ও গেলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়।

আবার দরজায় টোকার আওয়াজ। কুসুমিকা এসেছে। দরজা খুলতে উঠতে যাচ্ছে ভূপতিচরণ, সরোজ বলে উঠল, কিছু বললেন না তো ?

বিষণ্ণের হাসি হেসে ভূপতিচরণ বলল, একটু চিন্তা করতে দিন, পরে বলবো।

দরজা খুলল।

ভূপতিচরণকে খবর দিয়ে গেল কুসুমিকা—ওপরে ভাত বাড়া হয়ে গেছে দুজনের, ভূপতিচরণের আর সরোজের।

সরোজকে নিয়ে এলো ওপরে ভূপতিচরণ।

শোওয়ার ঘরেই খাওয়ার জায়গা করা। দেয়ালে তানপুরা ঝোলানো। গানের সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে ঘরে। হারমোনিয়াম বাঁয়া-তবলা মায় সারেঙ্গী। একদিকে একখানা সেকেলে বোম্বাই খাট। আয়না বসানো আলমারী একটা। দেয়ালে কোন ছবি নেই। না মানুষের না দেব-দেবীর।

দু'জনে খাচ্ছে, পর্দার আড়াল থেকে খাওয়ার তত্ত্বাবধান করছে কুসুমিকা। কালো ওড়নায় ঢাকা। আজ আর সেদিনের মতন গোলাপী শাড়ী গোলাপী ব্লাউস পরনে নেই। তবে আজো রং মেলানো জামা শাড়ী—সবুজ। কিন্তু ওড়নার রং বদলায় নি। সেই কাজল কালো। মুখ কেমন দেখা যায় না, বোঝা যায় না। এমনি বেশ ফর্সা।

ভূপতিচরণের নিষেধ সত্ত্বেও আবেগ চাপতে পারেনি কুসুমিকা। ভাত আর চাই কিনা জিজ্ঞেস করতে পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, অন্য কথা জিজ্ঞেস করে বসল সরোজকে।--

আচ্ছা, ডালিমতলার ওধারে কি যাতায়াত ছিল কখনো আপনার ?

ভূপতিচরণ হতভম্ব।

যেটুকু খেয়েছিল, ওই অবধিই ইতি হয়ে গেল। মাছ দিয়ে মাখা ভাত আর মুখে উঠল না।

আনন্দে আত্মহারা সরোজ। কুসুমিকার মুখে 'ডালিমতলা' শুনে, মনে হল ডালিমতলার যে বাড়ি থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসত তার কানে, সেই বাড়িতেই এসেছে যেন সে। যার গান শুনত, সেই যেন জিজ্ঞেস করছে।

সারা শরীরে আনন্দ ঠাসা।, গলার স্বর বেরুনোরও রাস্তা নেই। কয়েক মুহূর্ত লেগেছে অভিভূত ভাবটা কাটতে। কাটার সঙ্গে সঙ্গে মুখে নয়, মাথা নেড়ে জানিয়েছে 'হ্যাঁ'।

দু'জনেই দু'জনের ছোটবেলায় ফিরে গেছে ছোটবেলার ঘটনা বলার মধ্যে দিয়ে, একজন অন্যজনের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে সরোজ শ্রোতা, গায়িকা কুসুমিকা।

কলকাতা থেকে সরোজ আসে। গান শোনে। কুসুমিকাই পাঠিয়ে দেয় আবার মেসে। বলে, দেশে মা রয়েছে। বাবা নেই। গান শোনার জন্য কাজকর্ম ছাড়লে চলবে না।

বিপদ হয়েছে ভূপতিচরণের। সরোজ আসার সময় স্টেশনে গিয়ে আনতে হয়। যাওয়ার সময় পৌঁছেও দিয়ে আসে আবার। সরোজ বলে না, বরং আপত্তি করে।—আপনি এত স্নেহ করেন, বড্ড বাচ্চা ভাবেন আমাকে। ঝড় নেই বৃষ্টি নেই রোদ্দুর নেই—রোজ আসা যাওয়া—কত কষ্ট বলুন তো? আমার বড্ড লজ্জা করে। রাস্তাঘাট তো আমি চিনে গেছি।

রাস্তার ওদিকটায় বিরাট জলাভূমি। ভূপতিচরণ চেয়ে থাকে।

সরোজ বলে, ওটা কি—আমি তো জানি। আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই।

ভয়ের কারণ নেই বললেই কি মন মানে? ভূপতিচরণের যে স্বচক্ষে দেখা। অন্যমনস্ক ভাবে বলে ওঠে, না, না। কোন কষ্ট নয়। দিন রাতই তো বাড়িতে বসে আছি। বয়স হয়েছে। একটু নড়াচড়া না করলে একেবারে পঙ্গু হয়ে হয়ে যাবো যে। আমি কি আর নিয়ে যেতে পৌঁছে দিতে আসি? নিজের স্বার্থে। এইটা উপলক্ষ্য করে নিজের একটু চলাফেরা বেড়ানো, এই যা।

ভূপতিচরণের হাসির প্রলেপ লাগে ঠোঁটে। এ হাসি ভেতরের নয়! বিষাদের ছায়া মেশানো। ভদ্রতাব অভ্যস্ত হাসি।

রাস্তা চলতে চলতে দু'টি তরুণের মুখ ভেসে ওঠে। জলাভূমির ওপরে ভাসে কেবল। ভূপতিচরণকে পাগল করে তোলে। দু'টো মুখের ঠোঁট নড়ে ওঠে একসঙ্গে। বাতাসে ফিস ফিস করে বলে ওরা।— কতদিন আগলে আগলে বাখবে সরোজকে। আমাদের কাছে তো আসতে হবেই ওকে। তার চেয়ে ছেড়ে দাও না!

যতদূর চোখ যায়, ভূপতিচবণের চোখ থেকে দু'টি যুগল মুখ মুছে যেতে চায না কিছুতেই। স্টেশন অবধি ভেসে ভেসে চলে জলাভূমিব ওপব দিয়ে। ফেবার সময়ও ওই একই জ্বালা। বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত।

ওবা বলে, জানি, আমাদের নিয়ে তোমার জ্বালা। ইচ্ছে করে দিই না আমবা। আমরা যে ডুবে যাচ্ছি, ধরে তুলতে পারছো না তুমি? কেন—চুলেব মুঠি ধরে টেনে তোল না। আমরা যে ধবার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না কোনদিক দিয়েই। কাদায তলিয়ে যাচ্ছি। কাদাব পাতালে নামছি। নামছি নামছি। বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।

দু'চোখে হাত চাপা দেয় ভূপতিচরণ। অস্থির গলায় বলে ওঠে সরোজ, কি হ'ল—চোখে কিছু পড়ল নাকি? দেখি, দেখি দেখি।

ভূপতিচরণেব কান্নাভেজা কথা। বলে, না! কিছু না। চোখটা ডাক্তারকে দেখাতে হবে একবার। হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে ভীষণ।

চোখ বলে কথা, দেবী কববেন না মোটে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কাল কলকাতায় চলুন। উত্তরের আশায় ভূপতিচরণের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে সরোজ।

ভূপতিচরণ হাসতে হাসতে বলে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। এ চোখ অন্ধ হয়ে গেলে বাঁচতুম। তা হওয়ার নয়। আর দিনকতক দেখে তারপর একটা ব্যবস্থা তো করতে হবেই। কলকাতার ডাক্তার

দেখানো কেন,—বাড়িটা বেচে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে ডেরা বাঁধলেই তো হয়। এবার একটা কোন ব্যবস্থা না করলেই নয়।

মুখে বললেও, বাড়ী বিক্রি যে করা যাবে না জীবনে—এটা ভালোরকমই জানে ভূপতিচরণ। ভিটের মাটিতে ইঁটের গাঁথুনিতে অতৃপ্ত মানুষের চোখের জল শুকিয়ে রয়েছে, ব্যথার নিশ্বাস সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনি দিলেও নেবে না কেউ। তলায় তলায় চেষ্টা কি আর না করেছে ভূপতিচরণ? হয়রানই হয়েছে। খদ্দের এলেই গাঁয়ের লোকের কানভাঙানি। কুসুমিকার জীবনের দু'টি সত্যি ঘটনা ঘিরে এমন ডালপালা বিস্তার করবে ওরা, আগন্তুকরা ত্রাসে হাজার হাত দূরে পালাবে। কুসুমিকার জীবনে যে ঘটনা এসেছে, সেই ঘটনার শিকার হতে হবে সকলকেই।

ভূপতিচরণ ভাগ্যগণনা করতে জানে না। বলতে পারে না। কিন্তু যারা ভাগ্যগণণা করে, তারা তো কুসুমিকাকে সৌভাগ্যবতী সুলক্ষণা অনেক কিছু বিশেষণে ভূষিত করেছিল। মিলল কই।

বিনা কলঙ্কে কলঙ্ক রটল চতুর্দিকে। যে পাত্র দেখতে আসছে, বিয়ে করতে চাইছে, তাকেই নাকি কুসুমিকা গিলে খায়।

কুসুমিকার গানের গলা ভালো—এই কি ওর অপরাধ?

প্রথম এলো সুশান্ত।

এই গাঁয়েরই ছেলে। গানের টানে আলাপ জমাল ভূপতিচরণের সঙ্গে। ওর গান শুনতে আসে রোজ। রাস্তায় চলে, গুন গুন করে কুসুমিকার গান গায়। গানপাগল সুশান্ত কুসুমিকাকে পরিণয়ের বাঁধনে বাঁধতে চাইল। বাড়ির লোকের অমত ছিল না। মেয়ের একটা মস্ত খুঁত আছে সত্যি, কিন্তু সব খুঁত ঢেকে দেয় ওই কিন্নরীকণ্ঠ। বিয়ের দিন ঠিকঠাক। দুবাড়িতে—কুসুমিকার আর সুশান্তর—আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। গ্রামসুদ্ধ লোকও পাতপাড়ার জন্য বিয়ের দিন গুণছে ক্ষণ গুণছে।

কানে কানে মুখে মুখে চোখে চোখে কত কথাই না হাঁটছে চলাফেরা করছে। গুণ না থাকলে কি আর হয়? কুসুমিকা গুণী

মেয়ে। বছর ছয়েক হল বাড়ি কিনল ওরা এখানে। ছ-বছর তো নয়—যেন ছ'পুরুষের বাস ওদের এ গাঁয়ে। ছোট বড় সকলের সঙ্গে কি মেলামেশা কি ভাবভালোবাসা। সমস্ত লোকই তো হাতের মুঠোয়।

ডালিমতলার বাড়িটা দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। ঋণ শোধের পর যেটুকু পাওয়া গেল, কলকাতায় থাকা যায় না। গাঁয়ে বাস করতে বাধ্য হল ভূপতিচরণ।

বিয়ের দিনের ঘটনা মর্মান্তিক ঘটনা।

গায়েহলুদ হয়ে যাওয়ায় পর বারণ করেছিল সুশান্তকে বাইরে বেরুতে সকলে। শুনল না। দড়িছেঁড়া হয়ে বেরুনো যাকে বলে, সেইরকম বেরিয়ে এলো। গুরুজনদের অমান্য, বন্ধুদের হেনস্থা—দুর্ব্যবহারের চরম করল সকলের সঙ্গে। এরকম একটা করে না সুশান্ত। ঠাণ্ডা গোছের মানুষ। সেই মানুষ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ক্ষেপে উঠল। কারণ—কারণ একবারটি কুসুমিকার একখানা গান শুনে আসতে চেয়েছিল সুশান্ত। বাড়ির আপত্তি রাত্তিরে তো বাসরঘরে শুনতে পাবেই, এখন আবার যাওয়া কেন—এ অবস্থায় যাওয়াটা আচার বিরুদ্ধ। তা ছাড়া লোকসমাজ বলেও তো একটা আছে। ভালো দেখায় না। লোকে বলবে আদেখলা। যেতে হবে না।

আর দেখে কে। যাবেই—পৃথিবী একদিকে সে একদিকে। সুশান্ত শুভদিনে অশান্তির ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। চান না করেই। গায়ে তেলহলুদ মাখানো। কোরা লালপাড় ধুতি পরা। কোমরে নতুন গামছা বাঁধা। সেই অবস্থায়।

মৃত্যু টেনে নিয়ে এলো সুশান্তকে সকলের অগোচরে। দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটল ওর। রাস্তায় চলতে চলতে যেমন কুসুমিকার গান গায় রোজ, তেমনি গাইছে! রাস্তার ওদিকটায় জলাভূমি জানে। ওদিকে কেউ যায় না। ও গেল সেদিন। জলাভূমিকে দেখল রাস্তা, আর রাস্তাকে জলাভূমি। পেছনে যাদের নজরে পড়েছে, তারা

চিৎকার করে বলেছে, সুশান্ত জলাভূমির দিকে যাচ্ছো। রাস্তায় চলে এসো। ওটা রাস্তা নয়, ওটা রাস্তা নয়।

সুশান্ত সপ্তমে গলা চড়িয়ে উত্তর দিয়েছে, তোমরা মিথ্যে ভয় দেখালে, ভয় পাব না আমি। আমি ঠিকই যাচ্ছি।

পেছনের লোক ধরার জন্য ছুটে আসছে। প্রাণপণে দৌড়তে লাগল সুশান্ত।

জলার কাদামাটিতে পা ডুবল। ডুবে যাচ্ছে সুশান্ত।

রাস্তার গোলমালে ভূপতিচরণ বেরিয়ে এসেছে বাইরে। দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির, বুকের রক্ত জমাট! কুসুমিকা এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়। আর্তনাদ করে উঠল মুহূর্তের জন্য সুশান্ত—মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার আগে।—কুসুমিকা! বাঁচাও, বাঁচাও।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে জানলার ধারে কুসুমিকা।

জ্ঞান হওয়ার পর কুসুমিকার মুখে একই কথা—আমাকে ছেড়ে দাও! সুশান্ত ডাকছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

এটা একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেল কুসুমিকার।

ডাক্তাররা পরামর্শ দিল একটু বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে জলাভূমি দেখবে এখানে থাকলে। সুশান্তর মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে উঠবে তখুনি ওর চোখের সামনে।

বড় দিদিমার কাছে কুসুমিকাকে নিয়ে গেছে ভূপতিচরণ বেনারসে।

ডালিমতলার বাড়ি যেতে ভূপতিচরণ মেয়েকে নিয়ে এসেছে একবার বিধবা শাশুড়ীর কাছে। পিতৃভিটে বিসর্জন দেয়ার জ্বালা জুড়তে। তখন মাস আষ্টেক ছিল।

থাকতে হয়েছিল কুসুমিকার জন্য। জ্বালা জুড়তে এসে জ্বালা বেড়েছে।

শিবরাত্তিরের দিন কুসুমিকার উপোস। বিশ্বনাথ দর্শন করেছে। তার আগে দশাশ্বমেধ ঘাটে পাহাড় প্রমাণ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গঙ্গায় মাথা ডুবিয়েছে। কোন নিত্যকৃত্যের ত্রুটি হয়নি। দিদিমা বাড়িতে এসে বলল, এবার জল 'খা'। নাতনি উত্তর দিল, তোমার খিদে পায়, তুমি খাও না দিদা। আমার এখনো যে পুজো বাকি!

দিদার দুচোখে বিস্ময়।—বলিস কি লো? তুই কচি মেয়ে শুকিয়ে থাকবি, আর আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—লাজলজ্জার মাথা খেয়েছি কি—আমি খেয়ে বসে থাকবো! পুজো তো করিয়ে নিয়ে আনলুম। আবার কিসের পুজো?

—ঘরের শিবের বাতি বাকি। ঘি-ভর্তি মাটির প্রদীপে থালা সাজিয়ে হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেল কুসুমিকা।

উঠোনে শিবমন্দির। দিদিমার শ্বশুরের প্রতিষ্ঠা করা। পর পর চোদ্দ বাতি জ্বালল। পাথরের কালো কুচকুচে তেল চকচকে শিবলিঙ্গের সামনে এক একটা করে সাজিয়ে দিল। মাথা নিচু করে প্রণাম করছে। প্রদীপের শিখায় শাড়ীর আঁচল জ্বলল।

মজুরনী ভুলুয়ার মায়ের—বহিনজী জ্বল গ্যয়ি, বহিনজী জ্বল গ্যয়ি চিৎকারে তরতরিয়ে ওপর থেকে নেমে এলো ভূপতিচরণ।

ততক্ষণে মেয়ের বাঁ-অঙ্গটা ঝলসে গেছে। মুখখানাই বেশী। অমন সুন্দর মুখের বাঁদিকটা কি কুশ্রী হয়ে গেছে।

কুসুমিকা বাঁচল।

কিন্তু এ বাঁচা যে মরারই সামিল হল তার। বিয়ে, হবে কি করে, কে নেবে এ মেয়েকে ?

ভাবনায় ভাবনায় ভূপতিচরণ দিশেহারা হয়ে পড়তে লাগল। কত ডাক্তারি ওষুধ কবিরাজী ওষুধ মায় টোটকা— সাধুসন্ন্যাসীর স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ—কিছু আর লাগাতে বাকি রাখেনি মেয়ের মুখের বাঁদিকটা সুশ্রী করে তুলতে।

কিছুতেই কিছু হল না।

কালো ওড়নায় গোটা মুখটাই ঢেকে রাখত কুসুমিকা। মুখ বিকৃত হয়ে যেতে যত না দুঃখ পেয়েছে কুসুমিকা, তত দুঃখ পেয়েছে গানের গলা যেতে। কান্না-ভেজা গলায় বলেছে বাবাকে, একটা পয়ার কর বাবা! গলা গেলে বেঁচে কি লাভ আমার ?

বাবাও নীরবে আড়ালে চোখের জল মুছেছে রুমালে। গাইতে গেলে গলা বসে যায়, স্বর বেরোয় না একদম। সুর বেরুনো তো দূরের কথা। দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ভূপতিচরণ। ভূপতিচরণ নিরুপায়। চিকিৎসকরা রায় দিয়েছে, অনেক ওষুধ খাওয়ান হল, কিছু হল না। তাদের করবার কিছু নেই আর একই ওষুধে রুগী বাঁচছে, আবার সেই ওষুধে অন্যের কিছু হল না—মারাই গেল। চিকিৎসকের কি হাত আছে কিছু করার ? চেষ্টা শুধু।

ভগবানের ওপর ছেড়ে দিতে উপদেশ দিল চিকিৎসকেরা। যাকে দেখা যায় না। জানা যায় না। মনে হয় নির্দোষ মেয়েটার এমন হল—কেউ থাকলে রক্ষে করল না কেন ? এসব চিন্তায় মাথা গুলিয়ে যায় ভূপতিচরণের। কাকে আর বলবে ? শাশুড়ীকেই বলে, মনের কথা।

নাক-কান মলে শাশুড়ী বলে, বাবা বিশ্বাস রাখো। তুমি যদি নেই-নেই ভাবো—তোমার কাছে তিনি নেই। আবার আছে

ভাবলে তিনি আছেন। প্রার্থনা কর, শুধু প্রার্থনা। বাবরের প্রার্থনায় হুমায়ুন কি সুস্থ হয়ে ওঠে নি ?

ভূপতিচরণ প্রার্থনা করেছে। মনে মনে বলেছে, পৃথিবী জুড়ে যে বিরাট শক্তির খেলা চলেছে, সেই শক্তির কাছে প্রার্থনা করছি আমি। আগের মতো হয়ে উঠুক কুসুমিকার গলা।

প্রার্থনায় হল কি সাধুর দৌলতে হল কিছু বুঝতে পারা গেল না। আবার আগের গলা ফিরে এলো কুসুমিকার।

সন্ধ্যের দিকে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বাপ-মেয়ে বেড়াচ্ছে। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটা লোহার ছড়ের ওপর একটা লোহার টুকরো ঠুকে ঠুকে জলতরঙ্গের সুন্দর মিষ্টি বাজনা তুলছে। ভজন গাইছে। বৃদ্ধের গলাটিও এমন, কানে যেন অমৃত ঢালছে।

কাছে গিয়ে পা মুড়ে বসল কুসুমিকা। শুনছে, ঠোঁট নাড়ছে। মনে মনে গাইছে। দু'চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

চোখ বুজে গান গাইছিল সন্ন্যাসী। গান শেষ হতে চোখ খুলল। সামনে কুসুমিকাকে দেখে বলল, কেঁউ বেটি, রোতি কেঁউ ?

ভূপতিচরণ বলল, কেন কাঁদছে !

সন্ন্যাসী হাসল। বলল, হামারে সাথ গানা গাও।

অনেক চেষ্টা করল। পারল না কুসুমিকা। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আপন মনে কি ভাবল খানিক সন্ন্যাসী। তারপর কাঁদতে বারণ করল। ভূপতিচরণকে বুঝিয়ে বলে দিল! সদাসর্বদা কুসুমিকা যেন ভাবে, নিশ্চয় আগের গলা ফিরে আসবে তার। ঘুমনোর আগে যেন অন্তত আট-দশবার করে বলে রোজ। কোনদিন ব্যতিক্রম না হয়।

ভূপতিচরণের কানে কানে বলেছে, মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে ভেবে অত সারা হচ্ছিস কেন ? মানুষের সঙ্গে ওর বিয়ে নাই বা হল। নাই বা ওকে পছন্দ করল কেউ। কি এসে যায় ? গানই ওর স্বামী গানই ওর সন্তান গানই ওর প্রাণ। এই ধ্যানজ্ঞানে গানের ভজনা

করুক ও। গান ওর হবেই। ওর গান বনের পশুপক্ষীও কান খাড়া করে শুনবে। ভাবতে হবে আমার গান লোকে শোনামাত্র মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমার গান— গলা লোকের মনে বাজবে। ঘুমন্ত অবস্থায় জাগা অবস্থায়—সদাসর্বদা।

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বলেছে, যা হয় ভালোর জন্য— বুঝলি? মুখখানা ওরকম হয়েছে, ভালো। ঈশ্বরের ইচ্ছে, বিয়ে না হওয়া। গানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে চাওয়া তাঁকে পাওয়া—এটাই হয়তো ওর এ জীবনের সাধনা। সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর।

সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর—কথাটা সত্যি হোক, নিছক স্তোকবাক্য হোক কিন্তু এ সময়ের জন্য মস্ত সান্ত্বনা একটা। বেনারসে আবার এসেছে ভূপতিচরণ কুসুমিকাকে নিয়ে। আশা— সুশান্তর জন্য মেয়ের যে পাগল পাগল অবস্থা—সেরে যেতে পারে। আগের বারে সন্ন্যাসীর নির্দেশ মেয়ে মনেপ্রাণে পালন করেছে। এখনো করে যায়। গলা ভালো হয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছেয় ভালো হয়েছে। চাক্ষুষ প্রমাণ।

গঙ্গার ধারে ধারে মেয়েকে নিয়ে ঘুরেছে, সে সন্ন্যাসীটির দেখা মেলে নি আর। কিন্তু মনের পরিবর্তন হয়েছে কুসুমিকার। সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর—অনবরত তাই মনে হয়েছে। কুসুমিকা শান্ত হয়েছে। বাবা শুনিয়েছে, গানই তোমার স্বামীপুত্র। গান ধরেছে আবার কুসুমিকা।

মাসচারেক বাদে বেনারস থেকে বাপ-মেয়ে ফিরছে কালিকাপুরে।

যা-তা বটনার জ্বালায় কান পাততে পারেনি। একঘরে হয়ে থেকেছে নিজেদের বাড়িতে। গানই ওদের সঙ্গী। গানই ওদের শান্তি।

কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারল কই বরাবর? বছরচাবেক যা ছিল, তাবপবেই আবার বিপত্তি। এলো বিনয়। বিনয়কে নিয়ে এলো কুসুমিকার পিসতুতো বোন পূর্ণিমা। নিজের দেওর। গান খুব ভালোবাসে। কুসুমটার আইবুড়ো নাম যদি খণ্ডায়—চেষ্টা করতে দোষ কি?

ভূপতিচরণ বাজী হযনি। কুসুমিকাব ওপর আর তার ওপব গ্রামেব লোকের মনোভাবেব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। স্মরণ কবিয়ে দিযেছে সুশান্তব ব্যাপাব। আব বলতে ভোলেনি বেনারসের সেই সন্ন্যাসীর সান্ত্বনাবাণী—'সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর'···গানই স্বামী-সন্তান···।

পূর্ণিমা বলেছে, পিসেমশাই, ওনারা মানুষকে স্থির রাখার জন্য যখন যেমন উপদেশ দেয়া বোঝেন, দেন। বাস্তবে ওসব ধরে থাকলে চলে না চিরদিন। একটা নতুন ক্ষতের ওপর সাময়িক একটা প্রলেপ ওঁদের উপদেশ। তুমি আজ আছো, তারপর? মেয়েছেলেব একটা অবলম্বন না হলে কি চলে নাকি? গানে শান্তি আসতে পারে আনন্দ আসতে পাবে—স্বীকাব করি। তা বলে গান অভিভাবকদের গদি দখল করতে পারে কেমন করে?

পিসে কোন কথায় জবাব দিচ্ছে না, চিন্তামগ্ন। চিন্তা' করতে

সুযোগ দেয়া উচিত। পূর্ণিমা চুপ কর বসে রইল খানিক। পিসের জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনে বুঝল, কথাটা দাগ কেটেছে মনে। অন্য দিকে একটু-আধটু দ্বিধা আছে—সেটা থাকা সম্ভব। কি দ্বিধা জানে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা বলল, কুসুমের বদনামের কথা আমি কি আর ওকে বলতে বাকি রেখেছি নাকি ? পুড়ে যাওয়ার কথাও গোপন করিনি। সব বলে-কয়েই তো এনেছি। সব জেনেশুনেই তো এসেছে বিনয়।

কুসুমিকার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে বিনয়। আসা-যাওয়া শুরু করেছে প্রতিদিন। কুসুমিকার গান তার জপমালা হয়ে উঠেছে। একেবারে দ্বিতীয় সুশান্ত। সুশান্তর কথা মনে হলে, বুকের ভেতর ছাঁৎ করে উঠত ভূপতিচরণের। কেবলি মনে হ'ত একটা অমঙ্গল ঘুরেফিরে সাজপোষাক পাল্টে আবার আসছে হয়তো।

হ্যাঁ, সাজপোষাক পাল্টেই এলো।

সুশান্তের মতো গায়েহলুদের দিনে নয়, বিয়ের মাসখানেক আগে বিনয় চলে গেল। ঠিক ওইভাবে ওইখানে। জলাভূমির যে জায়গাটায় কাদায় ঢাকা মরণগহ্বর।

তখন দোতলার ঘরে বসে কুসুমিকা গাইছিল—যে গানটা শুনতে ভালোবাসত বিনয়। পহছানো জী আপনেকো, কৌন হ্যায় তুম, আর কৌন হ্যায় হম, হম হ্যায় তুম, আউর তুম হ্যায় হম··· ।

বিনয় আসছিল, শুনতে শুনতে একই ভুল করল। জলাভূমিকে রাস্তা দেখল, রাস্তাকে জলাভূমি।

ডুবে যাওয়ার সময় বিনয়ও কুসুমিকার নাম ধরে আর্তনাদ করে উঠেছিল। বাঁচাও-বাঁচাও বলে আকুলি-বিকুলি করেছিল।

তানপুরা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল কুসুমিকা। জানলায় এসে বিনয়ের ভয়কাতর মুখখানাকে হারিয়ে যেতে দেখেছে। এবারেও চতুর্দিক অন্ধকার দেখে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে কুসুমিকা।

কুসুমিকার জীবনের প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের মতো তৃতীয় অধ্যায়েরও যবনিকা পড়বে। চিন্তায় চিন্তায় পাগল হ'তে বসেছে

ভূপতিচরণ। যে ভাবে দ্রুত এগোচ্ছে সরোজ। বিধাতার রোষ নেমে এলো বলে ওর মাথায়।

ভূপতিচরণ এই ভয়ই করেছিল। গোড়া থেকে সতর্ক হয়ে চলেছিল। দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল কুসুমিকাকে। পারেনি। নানারকম বুঝিয়ে, ভয় ঢুকিয়ে সরোজের আসা বন্ধ করতে চেয়েছে, পারেনি।

নিজের কপাল চাপড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ভূপতিচরণের। কেমন করে বাঁচাবে সরোজকে? পথ নেই—নেই সরোজের বেরুনোর কোন পথ। কুসুমিকা যে সাক্ষাৎ কাল হয়ে দাঁড়াল ছেলেদের। লখিন্দরের লোহার ঘরেও মৃত্যু হয়েছে। কালনাগিনী ছেঁদা রাখার ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই। রেহাই নেই কালনাগিনীর হাত থেকে। গানের টানে মানুষের মন আটকে রাখার চিন্তা কুসুমিকা যদি না ছাড়ে, কারো মুক্তি নেই। রুদ্ধশ্বাসে মৃত্যু শিয়রে ঘোরাফেরা করবেই টপ করে গিলে ফেলার জন্য।

কুসুমিকাকে গান বন্ধ করতে বলবে ভূপতিচরণ? খোলাখুলি বলবে সব? না বলেও তো আর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। কুসুমিকাকে কিছু বলতে গেলেই ওর মায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে অমনি। মেয়েটার মুখের আদল কতকটা মায়েরই মতো। মুখের দিকে তাকাতে পারে না ভূপতিচরণ। মনে পড়ে যায় স্ত্রীর শেষের কথা।—তুমি ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারো—আমার কোন দুঃখ নেই। তবে একটু দেখেশুনে মেয়ে এনো। কুসুম বড় অভিমানিনী। তুচ্ছতাচ্ছিল্য যেন না হয় ওর।

ভূপতিচরণ স্ত্রীর হাত ধরে বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো কথা দিচ্ছি। ও আমার প্রাণের জিনিস তোমার মতো। জীবন থাকতে ওর কোন কষ্ট হতে দেবো না। আর কথা দিচ্ছি বিয়ে আমি করবোই না।

অনেক আদরের কুসুমিকা। ভূপতিচরণকে এমনভাবে বলতে হবে, কোন ব্যাপারে অভিমানের ক্ষোভের ছায়া যেন ঢেকে

না দেয় ওর মনকে। জীবনে কিছুই পেল না হতভাগিনী। শুধু আঘাত আর আঘাত। গানটা ওর একমাত্র সম্বল। সেটা বন্ধ করতে চাইছে ভূপতিচরণ। ক্ষণিকের আনন্দ যেটুকুও বা পেত, তাও হারাতে হবে ওকে। আর ভূপতিচরণ নিজে হাতে তুলে দেবে সেই নির্মম দণ্ড।

বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। স্ত্রীর জলভরা চোখ দেখছে। বিড় বিড় করে বলল ভূপতিচরণ। -- এই যে একটা ছেলে অকালে চলে যাচ্ছে, সব দোষ ঘাড়ে পড়ছে কুসুমিকার ওপর। কুসুমিকা খুনী। বলো, মেয়ের নামে এই কথা শুনে কোন্ বাপের না বুক ফেটে যায়?

পায়ে পায়ে এগুল ভূপতিচরণ। কুসুমিকার ঘরে যাবে। সরোজকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। কুসুমিকাকেও আর একটা নতুন বদনামের হাত থেকে রক্ষা করা। ঘরে এলো।

কুসুমিকা মেঝেয় কার্পেটের ওপর বসে তানপুরার ছেঁড়া তার খুলে ফেলে নতুন তার লাগানোর তোড়জোর করছে।

ভূপতিচরণ বসল। দরজা দিয়ে দুচোখ চক্কর দিয়ে এলো বারান্দায়। কেউ আছে কিনা, কেউ আসছে কিনা। চাপা গলায় বলল, মা, তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা ছিল। এখন সুবিধে হবে?

সুর বাঁধার গোল করে পাকানো সরু তারটা খুলল না আর কুসুমিকা। হাতের আঙুল থমকাল। পাশে রেখে বাবার মুখের দিকে তাকাল।

ভূপতিচরণ সমস্ত বলল। বলল, সুশান্ত বিনয়ের মতো সরোজও কি শেষে চলে যাবে মা। ওকে কি বাঁচানো যায় না? গানটা যদি—আর তোমার ইচ্ছেটা যদি—

বাকিটা আর বলতে পারল না ভূপতিচরণ। কে যেন হাত চেপে ধরল মুখে। বাবা কি বলতে চায়, বোঝার অসুবিধে হয়নি কুসুমিকার।

ভূপতিচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, তানপুরাটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখল কুসুমিকা। সুর বাঁধা আর হল না, গলা সাধা আর হল না। গম্ভীর হয়ে গেল কুসুমিকা।

দেয়ালে তানপুরা রাখার সময় বেসুরো তারের ঝংকার তুলে উঠল বাতাসে। কুসুমিকা শুনল বেনারসের সন্ন্যাসীর কথা·· সংসার হওয়া নয় ওর নয় ওর, নয় ওর··· ।

জানলায় এসে দাঁড়াল।

জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। মায়াবী পানায় ভর্তি। যেন মাটির ওপর মাথা নীচু গাছে গাছে ছয়লাপ।

কুসুমিকা দেখছে, কাদা-পানা দুহাতে ঠেলে দিয়ে কে যেন মাথা তুলছে। যে মাথা তুলল, তার মুখ অচেনা নয়। সুশান্ত। পাশে আর একজনের মুখ দেখা যাচ্ছে। বিনয়ের। ওরা দুজনে একসঙ্গে দুহাত তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

—কুসুমিকা আমাদের বাঁচাও।

দুচোখে হাত চাপা দিয়ে কুসুমিকা বসে পড়ল। তবু নিস্তার নেই। হাত চাপা অবস্থায় দেখছে, সরোজ ডুবছে, বাঁচানোর জন্য হাত নেড়ে ডাকছে ওকে। বাবার কথা শুনছে, সুশান্ত বিনয়ের মতো সরোজও কি শেষে চলে যাবে মা? ওকে কি বাঁচানো যায় না?

নিজে নিজেই বলে উঠল কুসুমিকা, না, না: সরোজকে মরতে দেয়া হবে না কিছুতেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দৌড়ে, ভূপতিচরণের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকেই।

জলাভূমির সেই খুনে জায়গাটার কাছে এসেছে কুসুমিকা। ওইটাই কুসুমিকার জুড়নোর স্থান, চিরশান্তির স্থান। তার গানের জন্য গলার জন্য চিন্তার জন্য আর কোন ছেলেকে চলে যেতে হবে না। সে চলে গেলেই, এ অমঙ্গল নিঃশেষ হয়ে যাবে এ গাঁও থেকে।

কুসুমিকা দেখছে, সুশান্ত-বিনয়ের মুখ ওপরে ভেসে উঠেছে। ওরা ডুবে যাচ্ছে আবার। ডুবতে দেবে না কুসুমিকা, ওদের চুলের

মুঠি ধরে তুলে নিয়ে আসবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কুসুমিকা জলাভূমির ওপর।

কুসুমিকা কোথায় চলে গেল, কেউ জানতে পারল না। লোকে বলে, কুসুমিকা রহস্যময়ী। কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে। দুষ্টু মেয়েছেলেরা ওই রকমই হয় থেকে থেকে। সর্বনাশী আর যেন এ গাঁয়ে না আসে। গ্রামটা বাঁচুক, শান্তিতে ঘুমুক। ভূপতিচরণ তানপুরায় হাত বুলতে বুলতে জানলার দিকে চোখ ফেরায়। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ব্যথাব নিশ্বাস ঝরে পড়ে—নিদারুণ যন্ত্রণা। মন বলে, অভিমানিনী নিরুদ্দেশ হয়নি কোথাও। সরোজকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে ওই জলাভূমিতেই।

সরোজ আসে মাঝে মাঝে গাঁয়ে। তার ধারণা একদিন না একদিন ফিবে আসবে কুসুমিকা নিশ্চয়ই।

প্রতিবারই চলতে চলতে জলাভূমির দিকে এগিয়ে যায়। অনেক—অনেক আগে। ডাকলে সাড়াশব্দ পায় না! জলকাদায় পা ডুবতে শুরু করে সরোজের।

ঠিক সেই সময় কুসুমিকাকে সামনের দিক থেকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখে। কুসুমিকা হাতের ইঙ্গিতে এগুতে বারণ করছে, পেছিয়ে যেতে বলছে। বলছে, আমি তো যাচ্ছি।

ঘুমের ঘোর আসে সরোজের চোখে। শক্ত মাটির ওপর শুয়ে পড়ে। বসে থাকতে পারে না এক মুহূর্ত।

সকালে গ্রামের বয়সী মেয়েরা চলার পথে সরোজ ঘুমুচ্ছে দেখে, চেঁচামেচি করে। হাত ধবে টেনে তোলে।

জেগে ওঠে সরোজ।

ফিরে যায় কলকাতায়।

আবার আসে কুসুমিকাকে দেখার জন্য। এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সরোজের কাছে। জানে গাঁয়ের লোক, জানে ভূপতিচরণ। ভূপতিচরণ উতলা হয় না সরোজের জন্য আর। ওর কোন প্রাণের ভয় নেই। যার জন্য মৃত্যু হত ওর—সেই তো ওকে বাঁচাচ্ছে।

আজো এসেছে সরোজ।

জলাভূমির কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ওকে কুসুমিকা। কুসুমিকা এগিয়ে আসছে। শক্তমাটির ওপর বসে আছে সরোজ।

শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ভারী হয়ে উঠছে দু'চোখের পাতা। ঘুম নামছে। একটা শান্তির আমেজ সারা শরীরে ঘুমের নরম পালক বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।

অনেক দূর থেকে কুসুমিকার গলার স্বর ভেসে আসছে যেন সরোজের কানে। আমি আসছি, আমি আসছি···মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে গলার স্বর। মিলিয়ে গেল।

তিন

সুলভার কাজলদীঘি চোখের তারায় কত অজানা-অতলের বিস্ময়-রাজ্য ভেসে বেড়াচ্ছে, যার দেখার চোখ আছে, সেই শুধু দেখতে পাবে।

আমাকে কিছু বলতে চায় নি প্রথমে। বলেছে, নাই বা শুনলেন আর ওসব কথা।

অনেক দেখা ঘটনার কাহিনী জমা থাকে মানুষের বুকের তলায়। মাথার মধ্যে অনেক দৃশ্য। এত কাহিনী, এত দৃশ্য—একটা শরীরে একটা মনের পক্ষে এই নিদারুণ বোঝা বওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। তখন কিছু প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, নিজেকে হাল্কা করে তোলার জন্য নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য। এ না হ'লে মনের সুস্থ ভাব বজায় থাকে না।

সুলভার মুখখানা বিষণ্ন হয়ে উঠল, দৃষ্টি করুণ। কি যেন কি ভাবল একটু। আমাকে বলল, জানতেই যখন এসেছেন একটুও শুনে যান তা হ'লে।

সে রাতে পথে পা বাড়াতে বার বার নিষেধ করেছেন মিশ্রজী।

আমি শুনি নি। জিদ করেই বেরিয়ে পড়েছি।

সুলভার কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন ওর সঙ্গে সে রাতের সেই রোমাঞ্চকর ট্রেনযাত্রার সঙ্গী হয়ে পড়েছি।...

মোকামার কাছ বরাবর আসতেই, বৃষ্টি নামল মুষলধারে। ট্রেনের ঝকঝক আওয়াজের সঙ্গে বৃষ্টির ঝমঝম মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

জায়গাটা খারাপ—আগে থেকেই সুলভা শুনেছে। শুনেছে কেন—প্রত্যক্ষদর্শী আর ভুক্তভোগীরা তাদের দুর্দশার অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করেছে যা—যে কোন মানুষ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে মরণের কোলে ঢলে পড়তে পারে মুহূর্তে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে মিশ্রজী সচেতন করে দিয়েছিল। বলেছিল, বেটি, হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। একা একা যাওয়াটা ভালো হল না। কাউকে সঙ্গে দিতুম, তর সইল না তোমার। বলার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া চাই-ই।

নিজের দীর্ঘনিশ্বাসে বিপদের আভাস অনুভব করল বোধ হয় মিশ্রজী। নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে বলে উঠল, ভেতরটা আমার খাঁ-খাঁ করছে কেন—বুঝতে পারছি না। আজ না গেলেই কি নয়?

বাপুজী, ঘাবড়াবেন না। আপনার এ মেয়ের জান বড় কড়া। তুলে আছাড় মারলেও মৃত্যু হবে না। হলে তো বাঁচতুম বাপুজী। সুলভার গলা ধরে এলো।

না বেটি, ওসব ভাবছি না। বিশ্বনাথের দয়ায় তুমি ঠিক পৌঁছে যাবে। ভালো খবর নিয়েই ফিরে আসবে।

মিশ্রজী সুলভার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। দু'চোখ ছলছল করছে। সুলভারও চোখ জলে ভরতি। টাঙার পাদানিতে পা রাখল সুলভা।

টাঙা ছুটছে, সাহস শূন্যে চাবুক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সপাং করে বসিয়ে দিচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। কালো, কুচকুচে তেজী ঘোড়াটা পিচের রাস্তায় খুরের খট-খট আওয়াজ তুলে, লাফাতে লাফাতে দৌড়োচ্ছে স্টেশনের দিকে।

স্টেশনে ভীড় থাকলেও, ট্রেনে উঠতে অসুবিধে হয়নি বিশেষ। কম্পার্টমেণ্টে একটাও ছেলে নেই। সব কটাই মেয়ে বসে আছে। ছোট বড়—সব বয়সী। লেডিস্ কম্পার্টমেণ্ট নয় এটা। কিন্তু উপস্থিত মেয়েদের দখলে গিয়ে, মেয়েদের কামরাই হয়ে গেছে বললে হয়।

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ট্রেন চলতে শুরু করল। চলছে। সকলের ঝিমুনি আসছে। তন্দ্রা-তন্দ্রা ভাব।

বেশ খানিক এগিয়ে যাওয়ার পর—মোকামার কাছাকাছি আসতেই, একটা বিভীষিকার রাজ্য হয়ে উঠল কামরার ভেতর।

রাতের ট্রেন, সমস্ত মেয়েছেলে। ট্রেনের জানলা-দরজা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভেতর থেকে। নিজেদেব মধ্যে আপোসে কথাবার্ত্তা হয়েছে—কেউ দরজা জানলা খুলবে না বাইরে থেকে কেউ ডাকাডাকি করলেও।

ট্রেন চলার পর থেকে কতবার যে জানলায় ঘা পড়ল ঠিক নেই। একই গলার স্বর একজনই ডাকছে শুধু।—ম্যাঁয় গির যাঁউ। খোল দিজিয়ে মেহেরবানি।

সুলভা দেখছে· সকলেব মুখে-চোখে ত্রাস ছেঁকে ধরেছে। সকলের ত্রাসে ভেতরটা থমথমে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বসে আছে সবাই।

সুলভা ভেবেছিল, দুষ্টু-বদমাশ যেই হোকনা— সাড়াশব্দ না পেলে, এ কামরার মোহ ছাড়বে। এরপর সাবা রাস্তা নির্বিঘ্নে কাটাবে তারা।

তা হ'ল না।

বিপদ অনুসরণ করে চলছিল এতক্ষণ, এবার নিজমূর্তিতে প্রকাশ

হওয়ার জন্য প্রস্তুত। হতে লাগল। জানলার ধাকাটা বেশ জোর জোর। যে দিকে বসেছিল সুলভা, সেই দিকের জানলাটা ভেঙে পড়ে বুঝি। কাঁপছে থর থর ক'রে।

কথা কইতে বারণ, তবু কথা না কয়ে উপায় ছিল না সুলভার।

ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। এরকম অসভ্যতাও করতে পারে মানুষ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, কৌন বেআদব। খোলেঙ্গী নহী।

বাইরে থেকে কর্কশ গলা,—দেখা দেতা হুঁ।

দড়াম-দড়াম ক'রে জানলায় লাঠির ঘা কি কিসের ঘা পড়ল কে জানে। জানলাটা খুলে গেল। চক্ষের নিমেষে কালো প্যাণ্ট-শার্ট পরা একটি জওয়ান ছেলে লাফিয়ে পড়ল ভেতরে।

হাতে রিভলবার। বলল, কেউ চিৎকার করেছো কি—বেঁচে ফিরতে হবে না আর।

দরজা খুলে দিল জওয়ান। পিল পিল করে ভেতরে ঢুকতে লাগল ওর সঙ্গীরা। প্রত্যেকের হাতে মজবুত লাঠি একখানা করে।

সুলভা দেখল, জওয়ানের যত আক্রোশ তার ওপর। সেই অসভ্য বলছে, খুলবো না বলেছে। জওয়ানের দুচোখ রক্তবর্ণ। কটমট করে তাকাচ্ছে। বলল, তোর লাশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দোব মাঠে। ওই তোর উচিত সাজা।

কথাটা কানে প্রবেশ করতেই সুলভার স্নায়ু শিথিল হয়ে এলো। আত্মরক্ষার চেষ্টা, পালানোর চেষ্টা বৃথা, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ যুঝে পেরে উঠবে না বলে কি যুঝবে না?

সুলভা মরার আগেই মরেছে। দেহ পড়ে আছে তার। অসাড় নিষ্প্রাণ। এইরকম একটা ভাব এলো সুলভার। হঠাৎ নীলাঞ্জনকে দেখে চমকে উঠল। নীলাঞ্জন ওদের দলের লোকের সঙ্গে ভেতরে ঢুকছে।

সুলভা বিস্মিত। এদের দলে নীলাঞ্জন। এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারা যায় না। জেগে জেগে চিন্তাও আসতে পারে না কারো কোনদিন। নীলাঞ্জনকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল সুলভা। যা

দেখছে, ও দৈত্যদের পথ বেছে নিয়েছে। ও ডাকাত ও খুনী ও লুটেরা ও বর্বর।

ভালোমানুষের ভদ্রতার মুখোশ পরে বেড়ায়। ও জানে না, এ কামরায় সুলভা আছে। জানলে, হয়তো বা ঢুকত না।

নীলাঞ্জনের চোখ দু'টো আগের মতো ঠাণ্ডা নয়। আগুন জ্বলা চোখ এখন। চেয়ে থাকা যায় না। জওয়ান হাত বাড়িয়েছে সুলভাকে তোলার জন্য, নীলাঞ্জন জওয়ানের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর চোখে কি দেখল কে জানে, হাত সরিয়ে নিল তক্ষুনি।

ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। মুখের রক্ত সরে গিয়ে কাগজ—সাদা।

এ অবস্থা শুধু একা জওয়ানের নয়, যাবা যারা ঢুকেছে সকলেরই একই দশা। নীলাঞ্জনেব চোখে ওবা কি দেখছে, কি দেখল ওবাই জানে।

কানরা থেকে সরে পড়ল সকলে এক এক ক'রে। ওদের পেছু পেছু নেমে গেল নীলাঞ্জনও।

…ট্রেন চলছে, ঝড়ের গতি। বৃষ্টিব জোব কম। টিপ টিপ করে পড়ছে।

প্রভাসের জন্যই তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলাঞ্জনের খপ্পরে পড়তে হয়েছিল সুলভাকে।

প্রভাস এসে হাজির হত যখন-তখন।

ঠাকুমা চলে যাওয়ার পর সুলভাদের বাড়িতে প্রভাসের আনাগোনা বেড়েছে। ছোটকাকিমা এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড করে গেছে। তার ভাই এ বাড়িতে আসুক, পছন্দ নয়। মাকে বলেছে, ধিঙ্গী মেয়েকে যা হোক তৈরী করেছো বটে। প্রভাসের মাথাটা নাই বা চিবিয়ে খেতে দিলে। বাড়িতে অনেক ছেলেই আসে। মা-বাপকে যে ছেলে অত মানত, তার কি তিরিক্ষি মেজাজ। সুলভাদের বাড়ি যেও না বললে, মারমুখী হয়ে তেড়ে যায়। মেয়েকে যদি না সামলাও, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় আমরা জানি।

গান শিখিয়ে ফিরেছে সুলভা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে ফেলে উঠছিল ওপরে। কাকিমার কথা কানে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল চাতালে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঢুকল না।

খোলা দরজা দিয়ে দেখছে, বাবা শুয়ে আছে খাটে। অসুস্থ। বুকের যন্ত্রণাটা বেড়েছে ক'দিন হ'ল। মা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে। দু'চোখের জল পড়ছে টপটপ ক'রে।

কাকিমা বলছে, কেঁদে পার পাওয়া যাবে না জেনো। মেয়ের গান শুনিয়ে শুনিয়ে প্রভাসকে বশ করতে চেষ্টা করবে না একদম! যা ছিরি মেয়ের! পেতনী!

ঘর থেকে বেরোনোর মুখে চোখ পড়েছে সুলভার ওপর।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। খ্যান খ্যানে গলায় বাড়ীসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে চিৎকার করে বলছে, প্রভাসের সঙ্গে মেলামেশা করবে না বলে দিচ্ছি। ওর মা-বাবা তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবে না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে কাকিমা।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সুলভা। বুকফাটা যন্ত্রণা। বুকে বালিশ চেপে পড়ে রইল বিছানায়।

ঠাকুমা চলে যাওয়ার পর ভিটে ছাড়া করেছে ওই কাকিমা। বাবার অংশ বিকিয়ে গেছে নাকি ছোটকাকার কাছে। কতবার টাকা ধার নিয়েছে। বারোমাসই তো অসুখ! সুদে-সুদে সমস্ত শেষ।

কটা বাড়িতে আর স্কুলে গান শিখিয়ে ক'টাকাই বা পায় সুলভা। তিন বোনের মধ্যে আর দু'বোন অফিসে ঢুকেছে সবে। কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটে। পুরোনো বাড়ির একখানা ঘরে দয়া করে থাকতে দিয়েছে কাকিমা। কাকিমা নতুন বাড়ি করে চলে গেছে অন্য জায়গায়।

বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। মা কেঁদে হাতে ধরে অনুরোধ করেছে, আর কিছুদিন থাকতে দিতে। বড় গান শিখিয়ে যা পায়, কর্তা তিন মেয়ে আর সে—দুবেলায় আটটা পাত। ওর টাকায় একবেলাই হয় না বোন, দু'বেলা হবে কোত্থেকে? এর ওপর ঘর ভাড়া নিতে গেলে, পেটে একটা দানা যাবে না কারো। মেজ-সেজ কাজ করলে কিছু কিছু ভাড়া তোমার নিশ্চয় দোব।

মায়ের প্রতিশ্রুতি পেয়ে রেখেছে কাকিমা।

সেই কাকিমা ক্ষেপেছে।

প্রভাসকে আসতে দেবে না। প্রভাস ভালোবাসে কিনা সুলভা জানে না। জানে প্রভাসের সহানুভূতি আছে তাদের ওপর যথেষ্ট।

বরাবরই ক্ষীণজীবী সুলভা। রংও চাপা। পাত্রপক্ষেরা দেখে মুখ ফিরিয়েছে। এই করে করে চোদ্দ থেকে চব্বিশে পড়েছে

সুলভা। বিয়ের কথা তো ওঠেই না। বিয়ে করবো না বলে স্থির করে ফেলেছেই সুলভা। বিয়ে কেউ করতে চাইলেও, তার আর করা চলে না। সংসার চলবে কি করে?

প্রভাসের পাশে সত্যিই তাকে মানায় না। প্রভাস ফর্সা সুপুরুষ। প্রভাস অবিশ্যি তাকে বলে, তোমার মতো এরকম কটা মেয়ের চোখ নাক চুল আছে? গলা—তুলনা নেই।

যখন ঠাকুমা চলে গেল, প্রভাসই এসে সান্ত্বনা দিয়েছে তাকে। ঠাকুমাই আগলে রেখেছিল এতদিন। দায়ে-অদায়ে গায়ে আঁচ লাগতে দেয়নি। বাবা তো বয়স থাকতেই অথর্ব হয়ে গেল। সুলভার লেখাপড়া-গান—সবেতেই ঠাকুমার অকৃপণ-হাত এগিয়ে এসেছে নির্দ্বিধায়। সকলের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্রী ঠাকুমার চোখে ভাবময়ী শ্রীরাধা মীরা।

যে পাহাড়ের আড়ালে ছিল, ঠাকুমা যেতে সে পাহাড় ধ্বসে মাটিতে মিশিয়ে গেল। চতুর্দিক অন্ধকার দেখল সুলভা। প্রভাস বুঝিয়েছে, ঠাকুমার আশীর্বাদে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।

ঠাকুমা গো! একলা ঘরে কেঁদে উঠল সুলভা।

মনে পড়ছে ঠাকুমার কথা। সুলভা সব তাতে তুই অস্থির হয়ে পড়িস। অত ভাবিস কেন? ভগবানের আশীর্বাদ তোর ওপর—ভগবানদত্ত গলা অমন—ক'জনের ভাগ্যে হয়? তোর গানই ধনসম্পত্তি অভিভাবক।

বুকে বালিশ চেপেই খাটে উঠে বসল সুলভা। মা এসে দরজায় টোকা মারছে। বালিশ রেখে উঠল। আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে, মুখ চোখ মুছে নিল থুপে থুপে। দরজা খুলল।

মা ভেতরে ঢুকেই বন্ধ করে দিল। অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠছে, চোখে জল। মায়ের চোখে জল দেখে, মেয়েরও চোখের পাতা ভিজল আবার। যা বলতে এসেছে মেয়েকে, মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। গলা বুজে রয়েছে কান্নায়।

সুলভা হাত ধরে নিয়ে এসে খাটে বসাল মাকে। নিজে বসল।

নির্বাক মুখে মা-মেয়ে বসে রয়েছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কাটল কিছুক্ষণ। খাট থেকে নামল মা। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

মা কি বলতে এসেছিল, না বলে গেলেও, সুলভা বুঝতে পেরেছে। কাকিমা যদি তাড়িয়ে দেয় দাঁড়াবে কোথা! প্রভাসকে এড়িয়ে চলতে হবে সুলভার। যতটা পারা যায়, বাইরে বাইরে কাটাবে ওর আসার সময়।

চার পাঁচ দিন ধরে দেখা হচ্ছে না কিছুতেই সুলভার সঙ্গে প্রভাসের। হন্যে হয়ে ঘুরছে প্রভাস সুলভাকে ধরার জন্য।

ধনুক ভাঙা পণ করে বসে আছে, যত রাতই হোক—আজ আর না দেখা করে যাবে না। এদিকে মায়ের বুক ঢিব ঢিব করছে ভয়ে।

কাকিমা এসে দেখলে, ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে তাদের এখুনি।

ছোট বোন নীতা মায়ের অবস্থা লক্ষ্য করেছে। দিদি কোথায় জানে। দিদির বন্ধু উষাদির বাড়িতে। খবর দিতে চলে গেল।

বোনের মুখে শুনল সুলভা। উসকো খুসকো চুল। পাগলের মতো প্রভাস। ক'দিন না দেখা করে, নিজে যে কত দুর্বল—বুঝতে পেরেছে পরিষ্কার। প্রভাস তার ভেতরের সব জায়গা দখল করে বসে রয়েছে।

প্রভাস তাকে দেখার জন্য অস্থির হচ্ছে, সে-ও কি না হচ্ছে? উষার বাড়িতে দেহ থাকলেও মন পড়ে থাকে ওরই কাছে। কতবার মনে হয়েছে ছুটে চলে যায়, কাকিমার মুখ ভেসে উঠতেই পা দু'টো আটকে গেছে মেঝেয়। মা-বাবা আর বোনদের নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে!

সুলভা অকূল পাথারে ভাসছে। কি করবে?

এত ভাবছিস কি দিদি? একবার দেখা হলেই চলে যাবো বলেছে।

সুলভা সচেতন হয়ে উঠল। নীতার সঙ্গে দুরু দুরু বুকে গেল বাড়িতে।

চোখাচোখি হতে দু'জনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো মুখে কোন কথা সরছে না। কেউ কারো কাছে এগিয়েও যাচ্ছে না। দু'জনের মনের একই অবস্থা। কত বছর বাদে যেন ওরা ফিরে পেয়েছে ওদের হারানো দু'জনকে। এত আনন্দে বিভোর যে দু'জন দু'জনকে দেখেও দেখার তৃপ্তি মিটছে না। সুলভা কি সত্যিই দেখছে প্রভাসকে? প্রভাসের সামনে কি সুলভা?

ওদের নিশ্বাসে আনন্দলোক, মনে আনন্দলোক, চোখে আনন্দলোক। বেশীক্ষণ বেঁচে রইল না এ আনন্দলোক। হিংসুকে অন্ধকার টুঁটি টিপে ধরল ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কাকিমার চরেরা খবর দিয়েছে—প্রভাস এসেছে।

হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির কাকিমা। রণচণ্ডী মূর্তি। রাগে কাঁপছে। গলার স্বর সপ্তমে চড়েছে।— কোন কথা শুনবো না। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙছো দাঁতের গোড়া! শয়তানী কোথাকার। দয়া করে রেখেছি বলে?

ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলভার ওপর। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। -বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা! ত্রিসীমানায় এসেছিস কি— তোর গুষ্ঠীসুদ্ধু বার করে দোব। টেনে ফেলে দোব সমস্ত জিনিষ রাস্তায়। বল্ কোনটা চাস? বেরোবি, না জিনিষ ফেলবো?

সুলভার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। বলল, আমি চলে যাচ্ছি আর আসবো না এ বাড়িতে।

চুলের মুঠি ছেড়ে দিল কাকিমা।

কাছে এগিয়ে এলো প্রভাস।—দিদি, অকারণ ওর ওপর অত্যাচার করলে। কোন দোষ নেই ওর। আমি নিজেই এসেছি।

থাম দিকিনি! তোকে কেউ সালিশী করতে আসতে বলেনি। দরদ দেখাতে এসেছেন উনি। যা বুঝেছি করেছি। যা বুঝবো, করবো। স্বয়ং ভগবান এসেও বাধা দিতে পারবে না আমায়।

বাড়ি যাওয়া বন্ধ সুলভার।

উষাও ছাড়ে না। বলে, আমার যদি একবেলা জোটে, তোরও একবেলা জুটবে। অত কিন্তু কিন্তু করিস কেন? বাবা যা রেখে গেছে—বাড়ি, কারবার—খাওয়া পরার অভাব হবে না। তুই এমন করে এ জিনিষ ও জিনিষ কিনে আনিস কেন?

কি আর আনতে পারি ভাই। আনার ইচ্ছে থাকলে, হওয়ার উপায় কোথায়? মাথা নিচু করে বলল সুলভা।

থাম্! অত লজ্জায় মাটির সঙ্গে কুঁকড়ে যেতে হবে না. ওই তো আয়, বাড়িতে দিতে হয়। যখন বেশী আয় হবে—দিস্—আমি নিজেই চেয়ে নোব।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে উষা। সামনের সোফায় সুলভা। মধ্যিখানের টেবিলে ইংরেজী বাংলা খবরের কাগজ। সুলভা ইংরেজী কাগজ তুলে নিল, চাকরি খালি কোথায়—চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে উষা টেনে নিল। বলল থাক। কাগজ দেখতে হবে না অত। বাইরে গিয়ে সুবিধেটা হবে কি বলত?

প্রভাস বাঁচবে। যেভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষ নারীর বল—দেশের বল। আমার জন্য একটা শক্তির অপচয় হয়ে যাচ্ছে!

ও মা গো। এত যদি টনটনে জ্ঞান—আগে ভাগে হলায় গলায় করতে গেছলি কেন রে মুখপুড়ী? মনে ছিল না তখন?

ভাবি নি এরকম হবে।

কথার মোড় ঘোরানোর জন্য উষা বলল, শোন, কোন্ সিনেমায় যাবি—কাগজ দেখে বল!

সত্যি বলছি, কোন সিনেমায়ই যেতে ইচ্ছে করছে না উষা। আজ দু'মাস হ'তে গেল, কোন পরিবর্তন হয় নি প্রভাসের। নীতার মুখে শুনছি, খালি আমারই নাম ওর-মুখে। বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। করবে না। সময় সময় মনে হয় কি জানিস? শুনলে, হাসবি—পাগলামি বলবি। আমি একটা বিয়ে করে ফেলি। তাহলে ওর মোহ ভাঙবে। রেগে গিয়ে বিয়ে করবে, ঘরবাসী হবে। আমায় ভুলবে, আমার নাম ভুলবে।

কথাটা মনে মনে লুফে নিল উষা। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। নীলাঞ্জনদা বলেছিল সেদিন, সুলভা বিয়ে করলে, দু'পক্ষেরই বাড়ির অশান্তি মিটে যায়। প্রভাসও মা-বাবার অশান্তির কারণ হয়ে ঘুরে বেড়ায় না আর। সুলভার অন্তর জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলেও, প্রভাসকে বাঁচানোর জন্য প্রভাসকে বিয়ে করবে না সুলভা কিছুতেই—প্রতিজ্ঞা করেছে। মা-বাবা বোনেদের আশ্রয় ভাঙতে ও চায় না মোটে। সুলভার ওপর আকর্ষণ আছে নীলাঞ্জনদার। প্রায়ই বলে, সুলভার মুখখানা মায়া মাখানো। দেখলে কষ্ট হয়। সত্যিই অন্যের সুখ শান্তির জন্য মেয়েটার কি ত্যাগ—দেখার মতো। এ মেয়ে যার ঘরে থাকবে, তার শান্তির সংসার গড়ে তুলবে।

তুই যখন বিয়ের কথা বললি, একটা কথা বলবো—রাগ করবি না? উষার কণ্ঠস্বরে সংকোচ।

প্রথমটায় সুলভা হতভম্ব হয়ে গেল। মনের দুঃখে বলেছে বলে

সত্যিসত্যি কি আর বিয়ে করবে সে? চিরকুমারী হয়ে থাকবে—সে-ও ভালো। তবে, প্রভাসের চোখের বাইরে যেতে হবেই তাকে।

এবার ঊষা বলল, থাক গে! তুই যদি শুনতে না চাস—বলবো না।

শুনবো না কেন রে! বলনা—কি বলতে যাচ্ছিলি।

নীলাঞ্জনদাকে পছন্দ তোর?

আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল সুলভা। কি উত্তর দেবে? নীলাঞ্জনদা কথায় কথায় নিজেই বলেছে, তার ক্ষয়রোগ ভালো হয়ে গেলেও, ডাক্তাররা বিয়ের অনুমতি দিলেও—বেশীরভাগ সময় সাবধানে থাকতে বলেছে। যতখানি পারা যায়, সংযমী থাকা ভালো। আবার ধরলে, বিপদ। ঊষার কি মাথা খারাপ?

সুলভা বলল, নীলাঞ্জনদার অসুখের কথা জানতে বাকি নেই তো তোর?

জানি বলেই তো বলছি। এ বিয়ে বিয়ে নয়। নার্স-রুগীর সম্পর্ক। সেবা করার কেউ নেই।

কথাটা ঠিক বলেছে ঊষা। নীলাঞ্জনের নিজের কোন ভাই-বোন নেই। ঊষা মাসতুতো বোন। এই বাড়িতেই মানুষ। শ্বশুর বাড়ি থেকে মাঝেসাঝে আসে যায়। দিনকতক করে থাকে।

নীলাঞ্জনের মা শয্যাগত যখন—মরার আগে বিধবা বোনকে—ঊষার মাকে এবাড়িতে এনে রাখে। বাপমরা নীলাঞ্জনকে দেখাশোনা করার কেউ নেই। সেই থেকে রয়ে গেছে এ বাড়িতে ঊষার মা।

মাসীকে বাইরের সকলে জানে নীলাঞ্জনের নিজের মা। ঊষা নিজের বোন। সুলভাও জানত তাই। এ বাড়িতে আসার পর ঊষা বলেছে সমস্ত কাহিনী।

যেদিন রাস্তায় বার করে দিয়েছে সুলভাকে কাকিমা, আশ্রয় দিয়েছে নীলাঞ্জনদা। বলেছে, আমার এখানে নির্ভয়ে থাকো তুমি। কোন দ্বিধা ক'রো না। জানবে—এটা তোমার বাড়ি।

··এ বিয়ে বিয়ে নয়—রুগী আর নার্স। ঊষার কথাটা ঠাট্টা

কিনা জানে না সুলভা—কিন্তু কথাটা মন থেকে মুছে ফেলতেও পারছে না। অবাস্তব ব্যাপার। তবু মনে হচ্ছে, তার এই পরিস্থিতিতে এইটাই বাস্তব। মনে মনে হাসল সুলভা। কি ছেলেমানুষি—এ আবার হয় নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, হ'লে কিন্তু মন্দ হত না। প্রভাস বাঁচত, এদিকে নীলাঞ্জনদারও মন ভরে থাকত—সেবার জন্য বাঁধা রইল ঘরে একজন।

সুলভা হেসে বলল, ভালো মতলব দিয়েছিস তুই। নীলাঞ্জনদা কি রাজী?

কথাবার্তায় মনে হয় তাই।

নীলাঞ্জন ঢুকল ঘরে। হেসে কুটিকুটি উষা।

নাটকের চেয়েও মানুষের জীবনে অনেক নাটকীয় মুহূর্ত ঘটে। যেখানে বিস্ময়ের অতল তলে ডুবে যায় মানুষ। যা ভাবার নয়, তাই ভাবিয়ে তোলে। যা ঘটার নয়, সহজেই ঘটে যায় তাই। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক-মন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। নেপথ্য থেকে কেউ যেন কলকাঠি নেড়ে সব কিছু করাতে থাকে হাসতে হাসতে। সে হাসি নির্মম না করুণার—তখন বোঝা যায় না। দেখা যায় পরে—কার্যকলাপের মধ্যে।

নীলাঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুলভার।

হালকা কথার বাঁধন শুভপরিণয়ে সাতপাকের বাঁধনে বাঁধা পড়ল

নীলাঞ্জন খুশী। খুশী মাসীও। কখন বলতে কখন ডাক পড়ে—বলা যায় না। এবার শান্তিতে মরতে পারবে। ছেলেটাকে দেখার ভাবনা নেই আর। নীলাঞ্জনের মাথায় জল পড়ার কথাই ছিল না। জল যে দিতে পেরেছে মাসী, এটা কম ভাগ্যের কথা নয়

ফুলশয্যার রাত। খাটের ছতরিতে ফুলের ঝালর। বাজুতে ফুলের মালা পাক দিয়ে দিয়ে ওপর অবধি উঠে গেছে। বিছানায় ফুলে ফুল। জ্ঞাতিস্বজনরা এসেছিল। লোকলৌকিকতা করে বাড়ি ফিরেছে।

খাটের ওপর নববধূর সাজে বসে আছে সুলভা। পায়ে পায়ে কাছে এলো নীলাঞ্জন। বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুস্বরে বলল। বড্ড রাত হয়ে গেল। তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো? কত লোক এল গেল। তোমায় ঠায় বসে থাকতে হয়েছে।

না। আপনার শরীর ভালো আছে তো? যা দৌড়ঝাঁপ — ওপর নিচে করাকরি।

না, না। একটুও ক্লান্তি আসেনি আমার।

শুয়ে পড়ুন গে! আর রাত করবেন না।

ঘরের বাইরে গিয়েই, তখুনি আবার ফিরে এসেছে নীলাঞ্জন। আমতা আমতা করে বলেছে, উষা ওঘরে শুতে যেতে বারণ করল। আজকের দিনটায় নাকি এ ঘরেই শোয়া নিয়ম।

মুখের দিকে তাকাল সুলভা। মানুষটা ছলকপট নয়। বাচ্চার হাসি মুখে! দেখলে, মমতা না জেগে পারে না। বলল, আপনি খাটে শোন। আমি না হয় ওঘরে যাচ্ছি।

পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে উষা। শুনেছে। চৌকাঠের এপারে পা দিয়ে হাতের ইশারায় সুলভাকে ডাকল। গেল সুলভা।

কানে কানে বলল উষা, আজকের দিনে দু'জনে আলাদা আলাদা ঘরে শুলে অমঙ্গল হয়। এখানেই শো তুই।

চলে গেছে উষা।

সোফায় এসে বসলো সুলভা।—আমি এখানেই শুচ্ছি। আপনি বসে থাকবেন না আর। শুয়ে পড়ুন।

আমি না হয় ওখানে যাই, তুমি এখানে এসো।

তা হয় না। বাবার অসুখে প্রায়ই রাত জাগতে হয়েছে আমার। কখনো সোফায় বসে থেকেছি, কখনো ঘুমিয়ে নিয়েছি একটু। আমার অভ্যাস বহুদিনের। নির্ভাবনায় ঘুমুন আপনি।

ফুলশয্যার রাতের রাত সব রাতই হয়ে উঠল নীলাঞ্জনের জীবনে।

বছরখানেক সুলভার মন বদলাল না। ফুলশয্যার রাতে তবু একঘরে শুয়েছিল দু'জনে। যদিও শয্যা আলাদা সে রাতের পরের রাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরে দু'জনে। দক্ষিণের ঘরে নীলাঞ্জন। মধ্যিখানে চাতাল। উত্তরের ঘরে সুলভা।

মাসীর মনোদুঃখ উষার মনোদুঃখ। নীলাঞ্জনের তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে মনটা কি রকম হয়ে ওঠে। রাত্তিরে যায় উত্তরের ঘরের দরজায়। টোকা মারে কিছুক্ষণ। দরজা খোলে না সুলভা। সাড়াও দেয় না।

বিয়ের দিন সাতেক পরে একবার মনে হল ওঘরে যাবে। গেছল। রাত খুব বেশী হয় নি। পৌনে এগার কি এগারো। রোজ যেমন করে সুলভা, সেদিনও তাই করেছে। কোন কাজেই ত্রুটি রাখে নি। খাওয়াদাওয়া দেখা, নীলাঞ্জনকে বাঁধা সময়ে খাওয়ানো।

কাজ সেরে ঘরে ঢুকেছে সবে। দরজায় টোকার আওয়াজ। দরজা খুলে, নীলাঞ্জনকে দেখে অবাক সুলভা। —আপনি? শরীর ভালো তো?

মুচকে হেসে, না ডাকতেই ঘরে প্রবেশ করল নীলাঞ্জন। বসতে বলার অপেক্ষা না করেই বসে পড়ল খাটে। বলল, এমনি এলুম। একা ঘরে ভালো লাগছিল না। একটু গল্প করবো বলে চলে এলুম।

. রাতজাগা উচিত নয় আপনার। চলুন ঘুমের ট্যাবলেটটা না হয় খাইয়ে দিয়ে আসছি আমি।

এলুম, একটু বসি-ই না। তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন ?

আপনার বাড়ি, আপনাকে তাড়িয়ে দেবো কি আমি !

আজ এইখানেই থাকি। ওঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আপনি এ ঘরেই থাকুন, তাহলে আমাকে ওঘরে যেতে হচ্ছে।

সুলভা বেরিয়ে যাচ্ছিল, হাত ধরে টেনে বসাল পাশে নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জনের দেহের উত্তাপের ছোঁয়া লাগছে সুলভার দেহে। ঘন ঘন উষ্ণ-নিশ্বাস পড়ছে ওর। নীলাঞ্জনের দু'চোখে উপোসী লালসা।

হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সুলভা।

আঁচলে চাবির গোছা ঝোলানো। পর পর চাবি সরিয়ে আলমারীর চাবিটা বার করল। আলমারী খুলে প্রভাসের ফোটোটা দেখিয়ে বলল, একজনকেই স্বামী বলে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছি আমি। আমার জন্য বিয়ে করল না সে। আজো করে নি, করবেও না। আপনি আমার কাছে স্বামীর চেয়েও অনেক বড়। শ্রদ্ধেয়-দেবতা। আশ্রয়দাতা। আপনার নার্স আমি। আপনি আমার আদর্শ। আদর্শের মূর্তি ভেঙে খানখান করে ফেলবেন না। তার চেয়ে আমায় বিদায় দিন।

একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে নীলাঞ্জন।

সকালে রাতের মানুষ মনেই হল না। সহজ-সরল হাসিখুশী।

দিন চারপাঁচ বাদে আবার দরজায় টোকার শব্দ। দরজা খোলে নি সুলভা। প্রতিজ্ঞা করেছে খুলবেও না। মানুষটার বিবেক আছে সব চাপা পড়ে যায় রাতের অন্ধকারে। রিপুর প্রবল তাড়না জেগে বসে থাকে শুধু। ভেতরে ছুটোছুটি করে। ওর অগোচরেই ওকে টেনে আনে সুলভার দরজা গোড়ায়।

যেদিন রাত্তিরে দরজায় টোকা পড়ে, পরের দিন সকালে নীলাঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সুলভা খেতে দেওয়ার সময়। না, কামের গন্ধ নেই। নিপাট ভালো মানুষেরই মুখ।

প্রায় রাত্তিরেই সুলভা নীলাঞ্জনের আসার শব্দ পায়। ফিরে যাওয়ারও। ভয় ধরে সুলভার। অন্য কোন কিছুর জন্য নয়।

ওর জীবনের জন্য। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে, কালব্যাধির হাত থেকে রক্ষে করতে পারা যাবে কি আর? প্রভাসকে বাঁচানোর জন্য নীলাঞ্জনের আশ্রয়ে এলো, বিয়ে পর্যন্ত ক'রে বসল। কিন্তু নীলাঞ্জন যে তাকে নিয়ে কামনার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়! নীলাঞ্জনকে বাঁচানোর জন্য কোথায় যাবে—কার কাছে যাবে?

রাতে ঘুম নেই সুলভার। চিন্তায় চিন্তায় আরো দিশেহারা। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে এইভাবে। হঠাৎ চিন্তার সমাধান হয়ে গেল একদিন।

ঊষা আসছে। মা হবে এবার। এই সুযোগে সরে পড়বে গানের গুরুদেবের কাছে—মিশ্রজীব্ কাছে। বেনারসে চলে যাবে। গুরুদেবের কাছে গানের পুঁজির থলি ভরভরতি। দেওয়ার জন্য উৎসুক। কতবার চিঠি লিখেছে, কবে বলতে কবে নেই। যা কিছু সঞ্চয় হারিয়ে যাবে। সুলভা, তুমি এসে নিয়ে যাও!

সেই চিঠি দেখাবে সুলভা নীলাঞ্জনকে। নীলাঞ্জনের মনে কোন খটকা লাগবে না। ছেড়ে দেওয়া সহজ হবে। বাধা দেবে না।

সুলভার যাওয়ার দিনে ঘরে এসে বসেছে খাটে পা ঝুলিয়ে' বলেছে নীলাঞ্জন, কেন যাচ্ছো, মুখে না বললেও আমি জানি।

ট্রাংকে কাপড় গুছোতে গুছোতে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়েছে সুলভা।

চমকালে কেন? আমি জানি। আমার উৎপাতের জ্বালায় তুমি টিঁকতে পারছো না। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি, রাত্তিরে এদিক মাড়াবো না। তুমি যেও না। তুমি আমার শরীরের জন্যই দরজা খোল না, বুঝি। আমাকে ক্ষমা কর।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একি বলে অপরাধী করলেন আমায়। ক্ষমা আমি চাইবো আপনার কাছে। আপনি আমার নমস্য। গলায় আঁচল জড়িয়ে, মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে সুলভা প্রণাম করেছে।

ট্রাংকটা খাটের তলায় ঠেলে রেখে বলেছে, আচ্ছা, আজ না হয়

নাই গেলুম। অন্য দিন যাবো। আপনি নিজে পাঠিয়ে দেবেন মিশ্রজীর কাছে।

সে যাত্রা যাওয়া বন্ধ করল সুলভা—যদি মন বদলায় নীলাঞ্জনের। দেখতে দোষ কি। যেভাবে কাকুতি-মিনতি করে বলল, খুব নির্দয় মনের না হলে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

এবপব প্রকৃতই নির্দয় হতে হয়েছে সুলভাকে।

প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি নীলাঞ্জন। চার পাঁচ দিন যেতে না যেতেই আবার এসেছে রাত্তিরে। আগের অভ্যেস মতো দরজায় আওয়াজ করে ফিবে গেছে আবাব।

আব কিছুতেই থাকবে না সুলভা। সকাল হলেই বাড়ি থেকে বেবোবে। মনকে এক কথা বুঝিয়ে বুঝিয়ে শক্ত করেছে। যত অনুবোধ উপবোধ করুক, কাল সকালে যেতেই হবে, যেতেই হবে যেতেই হবে।

যাওয়ার সময় এসে আটকেছে ফেব নীলাঞ্জন। সেই আগের অনুরোধ আগেব প্রতিশ্রুতি, কিছুতেই কিছু হল না। সুলভা দোতলা থেকে নামছে। সামনে এসে দাঁড়াল উষা। একটু ভেবে ছাখ সুলভা। মস্ত ভুল করছিস। যে ভয়ে পালাচ্ছিস, তাই না হয়ে বসে নীলাঞ্জনদার। তুই বুঝছিস না, দারুণ আঘাত পাবে। সামলাতে পারবে কিনা জানি না। ওঘবে মায়ের ছবিব সামনে দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ কবে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছে আর বলছে, মা, তুমি হলে কি এভাবে চলে যেতে পারতে আমায় ছেড়ে?

ঝব ঝব কবে কেঁদে ফেলেছে উষা। বলেছে, এত পাষাণ হোস্ না রে। ও যে বড় অসহায়।

কেঁদেছে সুলভাও। কান্না চাপতে দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্তাবক্তি করেছে। বলেছে, আমি থাকলে একটা সবনাশ হয়ে যেতে পারে রে উষা। একজন জ্বলছে, এও জ্বলছে। উষা, আমি আগুন। জ্বলে-জ্বলে নিজেকে পুড়ে মবতে দে! ওরা দু'জন বাঁচুক। ওদের বাঁচতে দে রে!

সুলভা চলে এসেছে বেনারসে।

এসেও মন বসাতে পারছে না। প্রভাস আর নীলাঞ্জনের ছুটো মুখ ভাসছে কেবল চোখের সামনে। সদাসর্বদা। ঘরে তিষ্ঠানো দায় হয়েছে। পালাই-পালাই ভাব। কোথা গেলে শান্তি পাবে, কি করলে শান্তি পাবে? মিশ্রজীকে বলল সুলভা।

মিশ্রজী বলল, বেটি, ঘাবড়াও মত। মীরা বন যাও? শান্তি মিলেগী।

মীরাবাঈ একজনই হয়েছিল।

একজন কেন বেটি, সব মেয়ের মধ্যেই মীরা রয়েছে। গানের সাধনায় জাগিয়ে তুললে, তবে না মীরা হবে।

সে কি সহজ ব্যাপার?

চেষ্টার অসাধ্য কিছু কি? মনকে ডুবিয়ে দাও গানের মধ্যে — ভজনের মধ্যে। কত আনন্দ, কত শান্তি। এ আনন্দ এ শান্তি কেড়ে নিতে পারবে না কেউ কখনো। এ জীবনভোরের।

গান যখন গাইত, ঠাকুমা শুনে ভাবে বিভোর হয়ে যেত। থামলে বলত, কেন থামালি রে! স্বর্গরাজ্যে ছিলুম এতক্ষণ। সংসারের বিষের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলুম খানিকটা সুলভ, তুই আমার রাধা, তুই আমার মীরা।

ছ'চোখ মুছে ঠাকুমা সুলভার চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, গুরুদেব বলতেন কি জানিস? গানের মতো গানে স্বয়ং ভগবান খেলা করেন। খেলা না করলে কি আর অমন আনন্দ পাওয়া যায়? সংসারে নিজেকে জড়াস নি রে। বড় অশান্ত। তুই দেবতার ফুল। ফুল হয়েই থাক।

তখন মনে করেছিল সুলভা, পর পর বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে বলে, ঠাকুমার সান্ত্বনা। এখন দেখছে, সান্ত্বনা নয়। সত্যিই বলেছে। সংসারে কি সুখ পেল সে? গরলই পান করল কেবল। অমৃত খুঁজে পেল না।

ঠাকুমা বলত, সংসার কি সকলের সয় রে? সয় না, নীলা যেমন সহ্য হয় না সবার। সংসার সহ্য হ'ল না সুলভার। মিশ্রজীও

বলছে, গানে ডুবে যাও। কিন্তু কেমন করে ডুববে? তানপুরায় সুর বাঁধতে গেলেই যে মনটা চলে যায় প্রভাসের কাছে, ছুটে চলে যায় নীলাঞ্জনের কাছে।

তারে সুর উঠতে চায় না। শুধু বেসুরো। মিশ্রজীকে বলল, তানপুরা নিয়ে বসতেই ইচ্ছে করে না, কি করে গান গাইবো?

আমার সঙ্গে এসো। গানের ঘরে নিয়ে গেল মিশ্রজী। দেয়াল থেকে তানপুরা পাড়ল। মেঝেয় সতরঞ্চি বিছানো। তানপুরা রেখে গেরুয়ার ঘেরাটোপ খুলে ফেলল। সুর বেঁধে, নিজেই তানপুরার তারে আঙুল চালাচ্ছে। বলছে, গাও বেটি! আমি গলা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে গাও!

আমি পারছি না। কান্না আসছে।

ভালো লক্ষণ। যে কাঁদতে পারে, সেই গান গাইতে পারে। কান্নাতেই তো আসল সুর খোলে। হৃদয়ের সুর। দেবতার পুজোর অর্ঘ্য। গানেতে না কাঁদতে পারলে, গানের দেবতা ধরা দেয় না। মিশ্রজী গান ধরল :

অগর প্রেম কি জিস দিলমে লগী
ঘাত ন হোতী
তো সাচ্ হ্যায় কি মোহন সে
মোলাকাত ন হোতী।
শ্রীগবিন্দু বতাতে হ্যায় কি
ঘনশ্যাম হ্যায় দিল মে,
ঘনশ্যাম ন হোতে তো
এক বর্ষাত ন হোতী।
যবে আঘাতে আঘাত প্রাণে
বাজিবে তোমার,
তখুনি বুঝিবে শ্যামের
মিলন বিহার।

কৃষ্ণ-মেঘ আসে যথা,
বরষা নামে গো তথা,
আঁখিবারি তার —
প্রভু কৃষ্ণ হৃদে যার।

মিশ্রজী তন্ময় হয়ে গাইছে। মুখে দিব্যজ্যোতি। ধ্যানের চোখে কাকে যেন দেখছে, কাকে যেন কাছে ডাকছে। দু'চোখ বোজা। জলের ধারা নামছে নিঃশব্দে গাল বেয়ে। যাকে ডাকছিল, সে বুঝি এলো। মিশ্রজীর ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি।

নিজের অজান্তে গুনগুন ক'রে গেয়ে চলেছে সুলভা। সুলভার মনপ্রাণ দেহে আবদ্ধ থেকেও যেন মুক্ত। সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। দুঃখকষ্টের আঁচ লাগার বাইরে। সুলভা কত হালকা। একটা সাদা পালকের মতো আনন্দের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

মিশ্রজীর সঙ্গে যতক্ষণ গান গায় সুলভা, ততক্ষণ দুনিয়ার সব জ্বালার ঊর্ধ্বে থাকে। কিন্তু গান থামলেই আবার বুকের কষ্ট। যেন কত উঁচু থেকে ধপাস করে পড়ে গেল নিচে। বুকটায় লাগল খুব। দম বন্ধ হয়ে যেতে যেতেও হ'ল না। হ'লে ভালো হ'ত। দগ্ধে দগ্ধে মরতে পারছে না আর।

চিঠি আসছে প্রতি সপ্তায়। মাস দুয়েক একটা সপ্তা বাদ নেই। ঊষা লেখে। নীলাঞ্জনদার শরীর ভাঙছে ভীষণভাবে। মুখের দিকে চাওয়া যায় না। কালি ঢেলে দিয়েছে। রাগ বৃদ্ধি হয়েছে। সামনে যাওয়ার উপায় নেই কারো। ডাক্তার দেখাবে না, ওষুধ খাবে না। এখনো যদি সুলভা বসে থাকে চুপচাপ, না আসে, তাহলে পরে আপশোসের অন্ত থাকবে না কিন্তু। চিঠিকে টেলিগ্রাম মনে করে, সুলভা চ'লে আসে যেন সঙ্গে সঙ্গে।

এমন লেখা পাষাণ হলেও, গলতে দেরী হবে না। গলে জল হয়ে যাবে। চিঠি পড়লেই সুলভার মন চলে যায় সেই মুহূর্তে নীলাঞ্জনের কাছে। আবার ফিরে আসে তখুনি। মনে পড়ে ঊষার কথা। ঊষা বলেছিল, না এসে থাকবি কেমন করে, দেখবো একবার।

তোর গোঁ হয়েছে কাল। গোঁ নিয়ে কদিন থাকিস দেখবো! নিজেকেই ছুটে আসতে হবে। নীলাঞ্জনদার শরীর খারাপ শুনলে— বসে থাকতে পারবি তুই? চুপ করে রইলি কেন? উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমার কাছে ছাড়ানছিড়েন নেই।

উত্তর দেয় নি সুলভা। চোখের জল এসেছে। মানুষটার একমাত্র ভরসা সে-ই। শিশুর মত আব্দার করে, অভিমান করে। আবার সুলভা গম্ভীর হ'লে বাধ্য ছেলের মতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। যা খেতে বলে খায় কোন প্রতিবাদ না করে। এ লোকের কাছে সুলভার স্ত্রীর ভূমিকা নয়। মায়ের ভূমিকা। চোখের জল ঊষা দেখতে পাবে বলে, মুখখানা পেছনদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে সুলভা।

ঊষার চোখ এড়ায়নি। ওরও চোখ কর কর ক'রে উঠেছে। গলাটা বুজে এসেছে। একটা ভয়ংকর নিস্তব্ধ জেঁকে বসল কয়েক মুহূর্ত। ঘরের এমোড় থেকে ওমোড় অবধি পায়চারি করলে ঊষা। কাছে এসে দাঁড়াল।

বেতের চেয়ারে বসে আছে সুলভা। মূর্তির মতো।

আড়চোখে দেখল ঊষা। বলল, আবার বলছি, ভেবে দেখ। একগুঁয়েমি করিস নি আর। নিজে কেঁদে কেঁদে মরবি, আর সকলকেও কাঁদিয়ে মারবি। থাকতে পারবি না গিয়ে। আসতে হবেই। আমি তাকে নিয়ে আসবোই।

ঊষা বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

জানলার ধারের পড়ন্ত রোদটা ফিকে হয়ে গেল।

সুলভা যতবার চিঠি পড়েছে, শেষে মনে হয়েছে, ঊষার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফিকির স্রেফ। সুলভার মন জানে ভালোরকম। দুর্বলজায়গায় বার বার ঘা মারছে তার। ঊষার কথা শুনেছে— আমি তাকে নিয়ে আসবোই।

মনে মনে বলেছে সুলভা, না, আমি যাবো না। ওরা বাঁচুক। আমি এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে এইভাবে শেষ হয়ে যাই।

শেষ হয়ে যাই বললেই হওয়া যায় নাকি? বরাতের লিখন

খণ্ডাবে কে? তোমার ভবিতব্য অন্যে ভোগ করবে? সুলভার ভেতরে কে যেন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে।

নিরালা ঘরে নিজে নিজেই চমকে ওঠে সুলভা।

কল্পনার কথা শুনে চমকে ওঠা আর সত্যি শুনে চমকে ওঠা— ছুটো তফাৎ। এ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ হিম হয়ে এলো সুলভার। মিশ্রজীকে চিঠি দিয়েছে ছ'জনে। উষা-প্রভাস। প্রভাসের চিঠিতেও ফিরে যেতে বলা হয়েছে আর দেরী না ক'রে। প্রভাস দেখতে যায় রোজ। নীলাঞ্জনের বাড়াবাড়ি চলছে। সুলভাকে দেখার জন্য ছটফট করছে নীলাঞ্জন।

যে দেখতে যাচ্ছে, তাকেই বলছে, আমার দোষে সুলভা চলে গেছে। ওকে ফিরিয়ে আনতে পারো না কেউ? চেহারা যা হয়েছে, চোখে দেখা যায় না। বিছানায় মিশে গেছে। সুলভা এলে, জানে না, যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, যদি বেঁচে ওঠে। এখন যা অবস্থা —যমে-মানুষে টানাটানি।

উষার চিঠিতে গালাগালি। রাক্ষুসী, কি নিষ্ঠুর রে তুই! বিশ্বাস না হয় দেখ। নীলাঞ্জনদার ফটো পাঠিয়েছি। আর হয়তো চিঠি লিখতে হবে না তোকে। বাঁচাতে গিয়ে মানুষটাকে মেরে ফেললি হতভাগী। আর আসতে বলবো না তোকে।

মিশ্রজী কাঁপা হাতে চিঠি-ফটো দিয়েছে সুলভাকে। নীলাঞ্জনের ফটো একটা কংকালের। চোখ ছ'টি সার। করুণাঘন আয়ত চোখ।

পাথর মূর্তির মতো বসে রইল সুলভা। এ কি করল সে? একটা মানুষকে তিল তিল করে শেষ করে ফেলল! কি ছুর্বুদ্ধি কি অদৃষ্ট!

সেদিন দশাশ্বমেধঘাটে সিঁড়ির ওপর বসে বসে কথকঠাকুর মহাভারত পড়ছিল। সুলভা-সুলভা করে কি পড়ছে, আর শ্রোতাদের ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাচ্ছে।

নিজের নাম শুনে মন টানল সুলভার। গিয়ে ওপরের পাথুরে

সিঁড়িতে বসল গালে হাত দিয়ে। উৎকর্ণ হয়ে নিবিষ্ট মনে শুনেছে।

সুলভা ব্রহ্মচারিণী যোগিনী। নিজের মনোমত বর না পেয়ে বিয়ে করে নি। মিথিলার রাজা জনকের গুণের কথা শুনে, গেল সেখানে। জনক রাজা সন্ন্যাসী যোগী—একটা মানুষ সব। সবেতেই আছে, সবেতেই নেই। কেমন ক'রে এমন হয়—পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল সুলভার।

সুলভা রাজকন্যা থেকে সন্ন্যাসী। সমস্ত শাস্ত্রে বিদুষী। তখনকার দিনে অদ্বিতীয়া বললেও ভুল বলা হবে না।

রাজসভায় গিয়ে হাজির হ'ল সুলভা।

নিজের মন, নিজের বুদ্ধি, নিজের সত্ত্বা, নিজের চোখ রাজার মনে বুদ্ধিতে সত্ত্বায় চোখে মিলিয়ে দিতে লাগল মনে মনে।

নিজেকে ভুলে গেল রাজা।

সুলভার মনের ইচ্ছে রাজার ইচ্ছে হয়ে উঠল। সুলভার চোখ দিয়ে সুলভাকেই দেখছে রাজা। অপরূপা। তিলোত্তমাকেও হার মানায়। সুলভা যা ভাবছে, রাজাও ভাবছে তাই।

মহাভারতের সুলভা কাহিনী শুনতে শুনতে আগাধ জলে ডুবন্ত অবস্থায়—অতল তলে তলিয়ে যেতে যেতে ওপরে ভেসে ওঠার—কিনারে পৌঁছনোর পথ খুঁজে পেয়ে গেল যেন সুলভা।

সত্যিই যদি অসুখ হয়ে থাকে নীলাঞ্জনের, ফিরে যদি যেতে হয়—যেতে পারে। নীলাঞ্জনকে নিয়ে আর কোন ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকবে না। সুলভা একমনে ভাববে, নিলাঞ্জন তাকে অন্য চক্ষে দেখুক। নীলাঞ্জনের দৃষ্টি বদলাবে। কামনাশূন্য দৃষ্টি!

চিঠি-ফটো আসতে সব চিন্তা ওলটপালট হয়ে গেল সুলভার। দু'চোখে অন্ধকার দেখছে সুলভা। হাত কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় পড়ে গেল চিঠি-ফটো।

মিশ্রজী বলল, বেটি ধৈর্য ধর। ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি গিয়ে নীলাঞ্জনকে নিজের মতো করে তৈরী কর। নিশ্চয় নীলাঞ্জন

তোমার মন বুঝবে। ভয় কি? সেবা করে, সুস্থ করে তুলবে তুমি। তোমার উপস্থিত এই ধর্ম এই ব্রত। আজ রাতেই যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলছি আমি। একে বৃষ্টি-বাদলের দিন। ট্রেনে একটু সাবধানে থেকো। একা যাবে। মোকামার কাছাকাছি জায়গাটা ভালো নয়। বিশ্বনাথকে প্রণাম ক'রে বেরিও। তিনিই সব বিপদের রক্ষাকর্তা।

ট্রেনে যা ঘটল, জীবনে ভুলতে পারবে না সুলভা। পুনর্জন্ম হল তার। ডাকাতটা তো পাঁজাকোলা ক'রে তুলে, চলন্ত ট্রেন থেকে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেযার মতলবে ছিল।

মতলবে কেন—এগিযেও এসেছিল। দরজা খুলবো না বলায় প্রতিশোধ নেযার জন্য দু'হাত নিশপিশ করে উঠেছে ওর।

মর্মান্তিক কাণ্ডটা ঘটতে দেয নি নীলাঞ্জন। ওদের দলের সঙ্গে ঢুকতে দেখেছে সুলভা ওকে। হতভম্ব হযে গেছে। ভেবেছে, সে কি ট্রেনের কামরায়, না নীলাঞ্জনদের বাড়ীতে, না অন্য কোথাও।

ওর দু চোখে আগুন ছিল ডাকাতরা আগুন দেখল, না আরো কিছু দেখল—জানে না সুলভা তবে ওদের সবার মুখে ভযংকর ভযের ছায়া। অত হম্বিতম্বি একদম নিস্তব্জ হযে গেল নিমেষে। মুখে কথা নেই কারো নেমে গেল সকলে।

ট্রেনের কোন যাত্রীর গাযে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারে নি দুর্বৃত্তরা। কারো একটা কানাকড়িও নিতে পারে নি নিতে হাত ওঠেনি ওদের। ওদের সঙ্গেই নেমে গেছে নীলাঞ্জন।

এতক্ষণ সুলভা যেন কেমন হযে গেছল। হতবাক্। সব দেখেছে। সব বুঝেছে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। দেহের সমস্ত শক্তি যেন হরণ করে নিযেছিল কে।

ট্রেন চলছে।

ট্রেনের ঝকঝক আর বৃষ্টির ঝমঝম দু'টো শব্দ মিলেমিশে নতুন রকমের আওযাজ উঠছে একটা। শুনতে পাচ্ছে সুলভা। শক্তি ফিরে পাচ্ছে। পাচ্ছে পূর্ণ সম্বিৎ।

ট্রেনে বসে বসে ভেবেছে, একটু আগে যা ঘটে গেল, এটা কি দুঃস্বপ্ন? দু'চোখ চক্কর দিয়ে এসেছে গোটা কামরাটায়। ডাকাতরা যা-যা করেছে সব চিহ্নই বর্তমান। জিনিসপত্তর তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। তার স্যুটকেস খোলা।

রাতভোর একটাই চিন্তা মাথার মধ্যে দাপাদাপি ক'রে বেড়িয়েছে সুলভার। ডাকাতরা এলো গেলো। নীলাঞ্জন? নীলাঞ্জন তো অসুস্থ! কি ক'রে এলো? না এসে পড়লে, প্রাণে বাঁচত না তো সুলভা।

তবে কি নীলাঞ্জন অসুস্থ নয় মোটে? তাকে ফেরানোর জন্য ষড়যন্ত্র সমস্ত? ডাকাত নিজেদের বন্ধুবান্ধব, আর সুলভার কাছে বীরত্ব দেখানোর জন্য নীলাঞ্জনের ওইভাবে আবির্ভাব-প্রস্থান। এই ট্রেনে অন্য কামরায় ছিল সবলে। মিশ্রজীরও হাত রয়েছে এ নাটকে!

সুলভার মাথা ঝিম ঝিম করছে। ভাবতে পারছে না আর। ভেতরে অজ্ঞাত অস্বস্তি। বাড়ি গিয়ে উষার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। তারপর নীলাঞ্জন আর প্রভাসের সঙ্গে। তাকে নিয়ে পুতুলনাচ নাচিয়েছে সবাই। আর কলকাতায় নয়, আপন-পর সকলকেই চিনেছে। সুলভা এমন জায়গায় পালাবে এবার, এমন জায়গায় লুকোবে—কেউ খুঁজে পাবে না।

সুলভার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ভেতরটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেউ নেই তার। কেউ বুঝল না তাকে, কেউ চিনল না তাকে।

বাড়ির সদর দরজায় চৌকাঠের ওপরে পা রাখতেই বুকের ভেতর ছ্যাৎ করে উঠল সুলভার। বাড়িটা নির্বান্ধবপুরী। একটা থমথমে ভাব। রেলিং ধরে ধরে ওপরে উঠল। নীলাঞ্জনের ঘরের মেঝেয় মাসী অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। উষা মাথায় জল দিচ্ছে।

চোখাচোখি হতে দৌড়ে এলো উষা। জড়িয়ে ধরে, ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই এলি, আর একটা বেলা আগে আসতে পারিস্ নি? কাল সন্ধ্যেয় দাদা চলে গেছে রে! কি ছটফটানি তোকে দেখার জন্য।

সুলভার মাথা ঘুরছে। পায়ের তলার মেঝে কাঁপছে। রাতের ট্রেনের নীলাঞ্জনকে দেখছে যেন। ডাকাতদের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসছে। সুলভা কি ট্রেনে যাচ্ছে এখনো?

চোখে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না আর সুলভা। চতুর্দিকে জমাট কালো। মিশমিশে কালো। পড়ে যাচ্ছে সুলভা। অনেক উঁচু থেকে নিচে, নিচে—আরো নিচে।

বেহুঁশ হয়ে পড়ল সুলভা। উষার কাঁধের ওপর মাথা লুটিয়েপড়ল।

চার

এমন বিব্রতবোধ জীবনে আর কোনদিন করিনি আমি। সাত-সমুদ্রের সব জলই কি উঠে এসেছে চিন্নুর দু'চোখের কোণায়? কান্না সংক্রামক ব্যাধি, নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। কখন ওই জলের বন্যা আমার দু'চোখের তারাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, অঝোরে ঝরিয়ে দিয়েছে তা আমি নিজেও জানিনি।

ওকে থামাবার কোন সান্ত্বনার বাণী আমার বুদ্ধির অভিধানে খুঁজে পাচ্ছিনা। ভেতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা। কেন মরতে গেছলুম আমি তামিলনাদ সঙ্গীত সম্মেলনে? গেছলুম না হয়, পোড়াচোখ চিন্নুর দিকেই বা ফিরে তাকাল কেন? চিন্নুর দুচোখে জল ঝরছে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করতে কি যে মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, হয়ত এই মর্মপীড়া ভোগ করার জন্য।

চিন্নুকে ডেকে নিয়ে এলুম আশ্রমে। কৌতূহলী মন আমায় এমন পাগল করে তুলেছিল, কারণ জানতে চেয়েছি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকেছে চিন্নু। তারপর যত না বিস্ময় আমার মনে, তত বিস্ময় ওর চোখে মুখে আর প্রতিটি কথায়।........

বিস্ময়ে ডুবে যাচ্ছে চিন্নু।

কান থেকে হাত নামালেই যত জ্বালা। বার বার দু'হাতে চেপে ধরতে হ'চ্ছে। চোখের পাতা বুজতে গেলেও, বুজতে পারছে না।

জোর ক'রে টেনে খুলে রাখছে কে যেন। যা ভাবা যায় না, যা দেখার কথা নয়, তাই দেখছে।

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে, কোন্‌টা সত্যি? যেটা এখন দেখেছে, না যেটা আগে দেখেছে?

আগেরটা এত সত্যি যে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চিনুর মন থেকে মুছে যাবে না এতটুকু। এটাকেও মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারেনা সে।

এখন যা দেখছে, যা শুনছে, যা ঘটছে—কতখানি সত্যি—পরখ করাব জন্য আকাশের দিকে তাকাল। ধোঁয়াটে মেঘ ছেয়ে আছে তেমনি। চোখ নামাল। রাস্তা ভিজে। বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। জামা-কাপড়ে হাত দিয়ে দেখল। সপসপে।

চিনু জেগে স্বপ্ন দেখছে না। সমস্তই ঠিক। তার শোনা-দেখাটাও বেঠিক নয়।

এগুতে চেষ্টা কবল।

ভিড়ের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে চিনুর ওপর। কার সাধ্যি এক পা বাড়ায়। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেয়ালে চেপ্টে যাচ্ছে। জীবন্ত সমাধি না হয় শেষে দম বন্ধ হয়ে।

না এগুলে স্বস্তি নেই। যে জন্য আসা, পণ্ড একদম। যে জন্য আসা অতদূর থেকে ছুটে—মীরাকে যা বলতে এসেছে—না বলে যেতে পারলে—মরণেও শান্তি পাবে না চিনু।

না বলতে পারার পরাজয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে যাবে না সে আর তামিলনাদে। রঞ্জন খবর দিয়ে আনিয়েছে তাকে। —শীগগির চলে আয় কলকাতায়। মীরা আসছে এখানে।

মীরা এসেছে।

এসেছে চিনুও।

চিনু যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, ভোর হওয়ার আগে এসেছে। এখনো আকাশের সব তারা মিলিয়ে যায়নি। রয়েছে কতক। মিলোচ্ছে ধীরে ধীরে। চারতলা বাড়ির দেয়ালটা দখল করেছে বেছে বেছে। এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যাবে মীরাকে।

দেখা যাচ্ছে। নিখুঁত মাপ জোপ। কিন্তু ধরা যাচ্ছে না, কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। এখানেই হয়েছে যত গোল। বিসমিল্লায় গলদ। চিনু দেখতে পেলে কি হবে, চিনু তো জনঅরণ্যে হারিয়ে যাচ্ছে—তার সঙ্গে মীরার চোখাচোখি হচ্ছে না একবারের জন্যও। হাতের ইশারায়ও যে জানাবে, সে এখানে আছে, তারও উপায় নেই।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, দু'জনে পাশাপাশি বসে রয়েছে। মীরা আর কন্নন। মঞ্চের ওপর দু'জনে। দু'জনেরই মুখে পরম তৃপ্তি। দেখলেই মনে হয়, শান্তির সাগর ছেঁচে যেন তোলা হয়েছে দু'টি পরম রত্নকে।

দু'জনকে এইভাবে একসঙ্গে দেখার আশা ক'রেনি চিনু। একজনেরই ক'রেছিল মীরার। মীরার দেখা পাওয়াটা নিজের সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছে চিনুর। কিন্তু কন্ননের দেখা পাওয়া—কেমন কেমন লাগছে তার কাছে। এটা অসম্ভব ব্যাপার।

দেশসুদ্ধু লোক বলে, কন্নন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এখানেও মঞ্চের ওপর থেকে মাইক কতবার যে ঘোষণা করল, তার গোনাগুনতি নেই কোন।—দীর্ঘ বারো বছর পর আবার ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে মীরা আয়ার। তামিলনাদ আর অন্ধ্রের একমাত্র শ্রেষ্ঠ লোকগীতির গায়িকা মীরাকে আমরা যেভাবে হঠাৎ পেয়ে গেছি, সেইভাবেই তামিল লোকগীতির শ্রেষ্ঠ গায়ক, অদ্বিতীয় গায়ক কন্ননকেও একদিন এই রকম হঠাৎই পেয়ে যাবো আমাদের মধ্যে। নিরুদ্দেশের পথ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হবেন তিনি মীরারই মতন। আমাদের অন্তরের টানে না এসে পারেন না।

পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোককে একবার, রঙ্গনকে একবার জিজ্ঞেস করল চিনু—নিজের দেখাটা মিলিয়ে নেয়ার জন্য—মীরার পাশে বসে কে উনি ?

প্রৌঢ় উত্তর দিল, উনিই তো কন্নন। চেনেন না? বিখ্যাত লোক। গান শোনেননি কোনদিন ?

কি আর বলবে চিনু! সে সব গল্প কথা হয়ে গেছে। শুধু কি

গান শোনা আর চেনা ? বন্ধু ছিল দু'জনে। এমন কতদিন হয়েছে— বাইরে একসঙ্গে গানবাজনা করতে গিয়ে—একজন অন্যজনের পাশে এসে না শুলে, ঘুম হ'ত না। শরীর খারাপের জন্য একজন না খেলে, অন্যজন দাঁতে কুটো কাটত না। গান গাওয়া নাওয়া খাওয়া— সব একসঙ্গে।

লোকে বলত, হরিহর আত্মা।

নিরুদ্দেশ! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল চিনু।

কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল রুমন। সে আর দু' একজন ভিন্ন অন্য কেউ জানে না বড় একটা। অতি গোপন ব্যাপার অতি গোপন জায়গা।

আমতা আমতা ক'রে ভদ্রলোককে চিনু বলল, রুমন যদি এসেই থাকে, তাহ'লে নিরুদ্দেশের কথাটা ব্যবহার করছে কেন ওরা? তিনি এসেছেন। বললেই তো আরো বেশী আনন্দ পায় সকলে?

কে জানে মশাই, অতশত জানি না। হয়তো বা রুমনকে সবাই ছেঁকে ধরবে বলে! প্রৌঢ় ভিড় ঠেলে, একটু ভেতর দিকে চলে গেল। পাছে আবার কোন নতুন প্রশ্ন ক'রে বসে চিনু। উত্তর দিতে গিয়ে গান শোনার ব্যাঘাত ঘটবে প্রতি পদে পদে।

রঙ্গন কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিসিয়ে বলল চিনুকে, আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে ভাই। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট দেখছি রুমনকে। মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে, কপালে টক টক করে তর্জনীর দু'টো টোকা মেরে রঙ্গন বলল, মাথাটা কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওখান থেকে আসতে পারে কি করে রুমন?

আকাশে কালো মেঘ জমাট বাঁধছে। চতুর্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনে নেমে এলো রাত। মণ্ডপের ভেতর নিওনলাইটের জ্যোৎস্না। ফিনকি ফুটছে।

মণ্ডপের কপালে আঁটা লাল সালুর রূপোলী হরফে আলো ঠিকরোচ্ছে। হলুদ-নীল-সবুজ। এক একটা হরফ নাচের তালে তালে পা ফেলছে যেন। তামিলনাদ সঙ্গীত সম্মেলন।

মঞ্চের ওপর মাইকের কাছাকাছি মীরার মুখ। মুখময় স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। মাইকটা একটু নামিয়ে উঠিয়ে, এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নিজের মনোমত ক'রে নিল মীরা।

গান শুরু হ'ল।

সেই আগের মিষ্টি মধুর গলা। গলা নয় তো, যেন বাঁশের বাঁশী বাজছে। বাজছে সেই কদমতলায়। মীরাকে প্রথম দেখেছিল যেখানে চিনু।

সে দিনের সেই গানই গাইছে।

·· অরুন্দুপোলাক এল ভয়ম্···।

এত ভয় কেন রে তোর ?

অভয় হয়ে—

আছে ঘিরে—

ভাঙরে ঘুমের ঘোর !

স্থান-কাল - সমস্ত ভুলে যাচ্ছে চিনু। ভুলে যাচ্ছে নিজের অস্তিত্ব। যেমন গেছল একবার।

মণ্ডপ উপচে কালো মাথার ভিড় রাস্তায় আছড়ে-আছড়ে পড়েছিল এতক্ষণ। মীরা গান ধরার সঙ্গে কালো ঢেউয়ের উথালপাতাল কমে গেল। অত লোকের নিঃশ্বাস একটা লোকের নিঃশ্বাস হয়ে পড়েছে যেন। অত লোক স্থাণুর মতন ধীর স্থির একটা লোক হয়ে গেছে যেন ! সকলে সঙ্গীতমুগ্ধ সম্মোহিত।

সুরের মূর্চ্ছনায় পেছনে চলে যাচ্ছে চিনুর মন। বিয়াল্লিশ থেকে বাইশে গিয়ে থমকালি। দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছত্রিশের মীরাকে দেখছে ষোড়শী।

মণ্ডপ দেখছে না। দেখছে এদিক-ওদিকে বড় গাছ ছোট গাছ। কদমতলার ওধারে মণ্ডহীরা নদীটা বয়ে চলেছে তরতর করে। কি চকচকে স্বচ্ছ জল। আয়না। মুখ দেখা যায়। তলায় মাছের সাঁতার কাটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মণ্ডহীরা গাঁয়ের মঞ্জীরা নদী।

বাতাসে শহুরে গন্ধ নেই। সবুজ মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ।······

দলবল নিয়ে রুকমিনী এসে পৌঁছেছে। লোকগীতি সংগ্রহ কববে, গবেষণা কববে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুবে। সঙ্গে কল্পনও রয়েছে। কল্পন তো থাকবেই। ও না থাকলে শিবহীন যজ্ঞ। রুকমিনীর ডান হাত। তামিল গানের পণ্ডিত। রুকমিনী বলে, ও না হলে সঙ্গীত বিদ্যামন্দির উঠে যাবে তাব। ওর জন্যই এত ছাত্রছাত্রী। প্রতিভা বটে!

পিত্তি জ্বালানো কথা। চিনু এত অনুগত—দেবীর চোখ যদি থাকত, কল্পনকে নিয়ে এত মাতামাতি করত না কখনো তাহলে। দশ মুখে ওর মহিমাকীর্তন করে বেড়াত না এত। ওকে নিয়ে রুকমিনীব সব-টাতেই বাড়াবাড়ি।

কল্পন আসার আগে চিনু চিনু ক'রে পাগল হ'ত। বলত, চিনু, তুমিই বিদ্যামন্দিবেব ভবিষ্যৎ। তোমাকেই প্রধান হয়ে চালাতে হবে। তোমবা শিখে-পড়ে না নিলে, আমি কি চিবদিন নারকোল দড়ির পাপোষ বুনেই যাবো? সকলের আবামে বসার মতন কার্পেট বোনা আব হবে না জীবনে?

কেন, হবে না কেন? তুমি যে পরিশ্রম করে লোকগীতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেলে, বাঁচবে লোকগীতি। বেঁচে থাকবে তুমি সেই সঙ্গে। আমি মৃত্যুপণ ক'বে বিদ্যামন্দিরের সেবা ক'রে যাবো আজীবন।

চোখের কোণ চক চক করে উঠেছে রুকমিনীর আনন্দে। চিনুর হাত ধরে বলেছে, এইটাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখে। তুমি আমার অভয়।

গানের কথা 'অভয় হয়ে আছো ঘিরে' কানে বাজছে শুধু চিনুর

নয়, দলের সকলের। বেশীর ভাগ তো রুকমিনীর না হলে উৎকর্ণ হয়ে, অমন ক'রে শুনবে কেন ?

গান থামল।

চিনুকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে, কন্ননের ডানহাতের কব্জিটা চেপে ধরে এগিয়ে চলল কদমতলার দিকে। পাশে পাশে একটু তফাতে চলছে চিনু। একেবারে কন্ননের গা ঘেঁষে রুকমিনী। বিরক্তির একশেষ। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে—এটা রুকমিনী কেন যে বোঝে না, চিনু ভেবে কিছু পায় না।

ব্যাপারস্থাপার দেখে দেখে চিনুর যে মাথার রক্ত ফুটেছে দিনরাত টগবগ করে, সে তাপেব ছোঁয়া রুকমিনীর মনের দোরে পৌঁছোয় না। যদি পৌঁছত, যদি মমতা বলে কোন বস্তু ভেতরে একটুও থাকত, তাহলে মমতার মোম গলে অন্তত তার জন্যে হু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ত সহানুভূতিতে।

অনুশোচনার আগুনে দগ্ধে মরত রুকমিনী। নিতান্ত ভালো-মানুষটাকে অবহেলার চোখে দেখে, কি অন্যায় না করছে সে। অন্যায়ের পথে, চিনু ব্যথা পায় যাতে—সে ধারে পা বাড়াত না আর দ্বিতীয়বার।

তা হবার নয়। কন্নন থাকতে রুকমিনী তার দিকে চোখ ফেরাবে না আর। বাইরের হু'চোখে কন্ননের রূপের ঠুলি আঁটা। মনের চোখে গুণের ঠুলি।

রুকমিনীকে ছাড়বে না তবু চিনু। শেষ অবধি দেখবে শেষ পরিণতি। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

কদমতলায় এসে উপস্থিত হতে, চমকে উঠল মীরা। রুকমিনীকে দেখে যত না লজ্জা হয়েছে, সঙ্গের দলবলকে দেখে ছেলেদের দেখে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছে। ফর্সা মুখে লালের ছোপ ধরেছে।

লজ্জা ভাঙল রুকমিনী। বলল, তোমার গলা শুনে দৌড়ে এসেছি ভাই। তোমার গান আমায় পাগল করেছে। গ্রামে গ্রামে

ঘুবে এই গানই শুনতে চেয়েছি এতদিন। আসল সুব পাইনি। সব নকল। তোমাব বাড়ি কোথা ভাই ?

নদীব ওপাবে গাছপালা দিযে তৈবী খুপবিটা দেখিযে দিয়েছে মীরা আঙুলেব ইশাবায।

উচ্ছাসে গডগড কবে রুকমি৽া যা বলে গেল, মমার্থ বুঝল না মীবা।

মেঝেয নামানো মাটিব কলসীটা কাঁখে তুলে নিল। জল ভবে রেখে বসেছিল। গান গাইছিল। বাড়ি যাবে এবাব। আড়-চোখে সহুবে লোকেব সাজসজ্জা দেখে নিল একবাব। চোখে নতুন ঠেকল। একটা অজানা নতুন অস্বস্তি স্নাযু বেযে ওঠানামা কবছে।

মীবা পাযে পাযে এগুচ্ছে।

ষোডশী মীবাব পিঠ বেযে বেণী ঝুলছে। একটা বুনো ফুলেব মালা জডানো।

রুকমিনী দেখছে আব মনে মনে ভাবছে। বিদ্যামন্দিবে নিয়ে যেতে পাবলে, এ মেযে একটা সম্পত্তি। মীবাকে অনুসবণ কবে চলেছে রুকমিনা।

আকাবাকা নদাব পাড়ে পা ফেলে ফেলে ঘবে এসে হাজিব হ'ল মীবা।

নাবকোল পাতাব চাটাই পাতা মেঝেয। বুডো কাকা গালে হাত দিযে বসে আছে চুপচাপ।

এলো রুকমিনী।

না ডাকতেই মাথা নিচু ক'বে ঘবে ঢুকেছে। ঘবেব চাল খুব নিচু। সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে একটু।

অবাক চোখে তাকিযেছে কাকা।

নিজেব পবিচয দিযেছে রুকমিনী।

যে সঙ্গীতে বিদ্যামন্দিবেব দেশেঘবে এত নাম, রুকমিনাব নিজেব হাতে গডা। জীবনপাত ক'বে চলেছে প্রাচীন লোকগাত প্রচলনেব জন্য। এই সৎ প্রচেষ্টায মীবাব কাকাব সাহায্য বিশেষ

প্রয়োজন। যার এমন শান্ত-সৌম্য মুখ, দয়ার কাজল আঁকা টানা টানা চোখ, তার কাছ থেকে শূন্য ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে শুধু হাতে ফিরে যেতে পারে না কেউ। বিফল হয়ে ফিরে যাবে না রুকমিনীও ঘরে ঢোকার মুখে, কাকার দিকে তাকিয়েই তাই মনে হয়েছে তার

লোকগীতির পুঁজিতে কাকা গভীর জলের মাছ। অফুরন্ত পুঁজি গিসগিস করছে দাড়ি গোঁফ আর মাথার অর্ধেক অবধি কামানো মাথার মধ্যে। ভাইঝির গানেতেই মালুম হয়ে গেছে।

মনে মনে যা ভেবেছে রুকমিনী, না রেখে ঢেকে সমস্ত বলেছে কাকাকে। বলেছে, মীরাকে নিয়ে গান শেখাতে চায় সে। যা জানা আছে, সব উজাড় করে দেবে ওকে। তার বিনিময়ে মীরা কাকার আর তার অভিজ্ঞতার ফসল পুড়িয়ে দিয়ে বেড়াবে অকাতরে—সকল দেশের সকল মানুষকে। আনন্দের ছোঁয়া লাগুক অশান্ত পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে মাটিতে-পাহাড়ে নদীতে-সমুদ্রে!

ফোকলা দাঁতের হাসিতে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাঁপা গলায় আস্তে আস্তে বলেছে, বসার জায়গা নেই, ছোট্ট কুঁড়ে। তোমাদের মতন লোককে কোথায়ই বা বসাই?

কাকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রুকমিনী কাকাকে সহজ করে নেবার জন্য বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। বেশ দাঁড়িয়ে আছি আমরা। আমরা তো আপনার ছেলেমেয়ে। অত সংকোচ বোধ করার কি আছে? ছলছল করে উঠেছে কাকার দু'চোখ।

বলেছে, অভাগিনী মীরার বাপই দেহাতি গানে ওস্তাদ ছিল। মেয়ে তার কাছে কাছে বসে শুনত। বাপের গলায় গলা মিলিয়ে গাইত—সোনালী ফসলে ভরে উঠুক ক্ষেত···।

অসময়ে এমন বাপকে হারাতে হ'ল। মাটা একটু-আধটু জানত, ওর বরাতে রইল না আর বেশীদিন। মা-বাপ মরা মেয়েকে নিয়ে তার যে কি জ্বালা হয়েছে, কাকে বোঝাবে! একে ধড়ধড়ে ভাঙা শরীর, তার ওপর মেয়ের চিন্তা। যে ভয়ে বিয়েথা করেনি, সেই

ভয় তাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল। সংসারের দায়দায়িত্ব মাথায় পড়ল বজ্রাঘাতের মতন।

বৃদ্ধ কাকা। মীরার চিন্তায় পাগল হয়ে উঠছিল—কি করা যায়, ওর জীবন চালানোর ব্যবস্থা হতে পারে কিভাবে, বড় হয়েছে, পাত্রস্থ করলেই বা কেমন হয়, গরীবের ঘরে কোন উদার পদার্পণ করে কি কখনো?

এরা এসেছে। ঈশ্বর প্রেরিত। স্বকর্ণে শুনেছে ঈশ্বর প্রার্থনা। কাকাকে বলতে হয় নি কোন কথা। নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাইছে মীরাকে। দুঃখিনীর ভাগ্য ফিরবে বুঝি এবার। বিধি সদয়।

আকাশ-পাতাল কি এত ভাবছে কাকা? উত্তর দেবার নাম নেই। রুকমিনীর ধৈর্য ধরা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বলল, আমরা কেমন. আমাদের বিদ্যামন্দির কেমন—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসুন না তামিলনাদে গিয়ে একবার। তারপর বোঝেন যদি, আমাদের ওখানে ভাইঝিকে শিখতে দেবেন, মনঃপূত না হলে দেবেন না। গিয়ে দেখবেন, টাকা দিয়েও আমাদের বিদ্যামন্দিরে ঢুকতে পারে না অনেক ছেলেমেয়ে।

কাকার মুখের দিকে চেয়ে রইল রুকমিনী কিছুক্ষণ। কাকাও একবার মীরার দিকে একবার তার দিকে চোখ ফেরাল। কি যেন কি ভাবল একটু। বলল, তোমাদের সঙ্গেই মেয়েকে নিয়ে যাবো আমি।

তামিলনাদের শহর ঘুরে ঘুরে দেখেছে কাকা। দিনকতক ধরে রয়েছে এখানে। যত্ন আত্তির কোন ত্রুটি করেনি রুকমিনীর। রুকমিনীর এমন আপনজন হয়ে উঠেছে কাকা যে, তাকে বলে, তুমি আমার পূর্বজন্মে নিশ্চয় মেয়ে ছিলে—নাহলে এত টান কি করে হল?

রুকমিনী হেসে বলে, কাকা, তাই তো ভাবি—যোগাযোগটা অদ্ভুত! পাশের গাঁয়ে যাওয়ার কথা, গেলুম কিনা ও গাঁয়ে। কে

যেন ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেল আমাদের অজান্তেই। আর গাইবি তো গা না হয় অন্যসময়ে, তা নয়—আমাদের শোনানোর জন্যই যেন জলের কলসী ফেলে রেখে, ঘরে না ফিরে, গান গাইছে মীরা কদমতলায় বসে বসে। আরো আশ্চর্য, আমরা ওই রকম গানেরই খোঁজ করছি। কোথায় পাওয়া যায় কে জানে।

কাকা বলল, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে যেমন ভগবান আমারও তেমনি করেছে। তোমাদের হাতে ওকে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আপনি কিন্তু আসবেন মাঝে মাঝে।

শহরে তো থাকেনি কখনো। মন খারাপ হতে পারে বৈকি। এলে গেলে মনটা স্থির থাকবে বরং। গানে মন বসবে। বলে, রুকমিনী বুকে চেপে ধরেছে মীরাকে।

মীরার দু'চোখের কানায় কানায় জল।

রুকমিনীরও গলাটা ধরে এসেছে। ভিজে ভিজে। বলল. কাকা আবার আসবেন তো! আমি তোমার বড় বোন। কোন ভয় নেই।

ঠোঁট ফুলিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতন কেঁদেছে মীরা। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কাকা।

মীরাকে পাশে নিয়ে খাটের ওপর বসেছে রুকমিনী। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দিয়েছে উৎসাহ দিয়েছে—তুমি যখন বড় হয়ে উঠবে—সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী হবে, তখন কাকা সুখী হবেন তোমার। কত শ্রদ্ধা পাবে কত ভালোবাসা পাবে দশজনের কাছ থেকে। গুরুজনদের আন্তরিক আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলবে তুমি নিজেকে। শিবের পায়ের প্রসাদী ফুল তুমি—

বাকিটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আঁচলের খুঁট দিয়ে কাজল ধোয়া চোখের জলের দাগ মুছে দিল গাল থেকে রুকমিনী। মীরার কান্না থেমেছে। আর ওকে দেশের কথা মনে মনে ভাবতে দেয়াও

উচিত নয়। একলা বসিয়ে রাখলে কাকার মুখ ভেসে উঠবে। কাঁদবে আবার।

গানের ঘরে নিয়ে এলো রুকমিনী।

ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে। কন্ননও। চিনু ওঠে নি। বসে বসে সুব ভাঁজছে চোখ বুজে।

মেঝের ঘব জুড়ে সবুজে ছোপানো দড়ির কার্পেট। দেযালে দেয়ালে রুকমিনীর ছবি। এক এক জায়গায় এক এক অনুষ্ঠানেব। মঞ্চেব ওপব বসে গাইছে সে।

সকলকে বসতে বলে, বসল রুকমিনী। পাশে বসেছে ম বা। চোখ বুলিয়ে দেখছে ঘরখানা। সবুজেব সমারোহ। দবজা জানলা পরদা বাজনাব ঘেরাটোপ—সবই এক রঙা। গোটা ঘবটায়, ঘবেব জিনিসে সবুজ ঢালা।

মীরাব অশান্ত মন শান্ত হয়ে আসছে। চোখেব কোণ জ্বালা ক'রে উঠছে না আব। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ভালো লাগছে ঘবেব সকলকে। সকলেব মিষ্টি হাসি। ভালো লাগছে রুকমিনীকে।

কন্ননেব সঙ্গে দেখা এই প্রথম নয়। মঞ্জরীবার্গায়ে হয়েছে। সেখানে গানের বেশ ধবে গানের মানুষেব কাছে পৌছানো, গানেব মানুষকে দেখা-চেনা। এখানে ছাত্রী আব শিক্ষক হিসেবে দু'জনেব সম্বন্ধ পাতিয়ে দিল রুকমিনী নিজেই।

কন্ননের দিকে চেয়ে বলল, তোমার নতুন ছাত্রী! তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস. একে তৈরী কববে মনেব মতন করে। নিজেব মতন করে। এ আমাদের বিদ্যামন্দিরের নাম বাখবে, তোমার আমার—সবাব মুখ উজ্জ্বল করবে।

কন্নন এমনিতেই লাজুক-বিনয়ী। লজ্জায় নুয়ে পড়ল আরো। বিনয়ে কথা আটকে যাচ্ছে। থেমে থেমে বলল, কি বলছেন আপনি। আমি আর কতটুকু জানি। আপনি স্নেহের চোখে দেখেন বলে, অনেক বড় করে ভাবেন।

তা নয়, যা সত্যি তাই বলছি। তুমি আমাদের লোকগীতির কুবের-রাজা। বিশেষ ক'রে তামিল গানের।

কেন—মীরাও তো তামিল গান জানে খুব ভালো। তামিল গানই তো ও গাইছিল সেদিন।

মীরার চিবুক ধরে একটু নেড়ে দিল রুকমিনী। বলল, কার কাছে শিখেছিলে বোন?

মীরা মৌন। মুখ নিচু ক'রে বসে আছে।

রুকমিনী নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করছে। জিজ্ঞেস করাটা ভালো হয় নি। মন ঘোরাতে গিয়ে মনে পড়িয়ে দিয়েছে পূর্বস্মৃতি। কাকার মুখে শুনেছিল, ওর বাবা গুণীলোক ছিল লোকসঙ্গীতে।

কাকা মীরার কাছে এখন দূরের। বাবার বাবা এতদূরের যে, সে দূর থেকে ওর কাছে ফিরে আসবে না আর। নিজের বাপের কথা মনে পড়ছে রুকমিনীর। ছোটবেলায় সে-ও হারিয়েছে। মীরার জীবনের সঙ্গে এক্ষেত্রে তারও প্রায় মিলই রয়েছে অনেকখানি।

রুকমিনীর প্রথম গানের পাঠ নেয়া বাবার কাছেই।

ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছে। আর বসে থাকলে সংযত ক'রে রাখতে পারবে না নিজেকে। কান্নার বন্যা ছুটবে চোখে। বাবাকে মনে পড়ে যখন, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে সে কেঁদে নেয় কিছুক্ষণ। সেই সময় দেখা করে না কারো সঙ্গে। সবাইকে বলে দেয়া আছে, দরজা বন্ধ দেখলে কেউ যেন না ডাকে, বিরক্ত না করে। বুঝবে অসুস্থ। একটু সুস্থ হলে নিজেই বেরিয়ে আসবে।

ডাকে না কেউ। কান্নার পর মন হালকা হয়ে যায় কিছুটা। চোখের জলে কাজল ধুয়ে গেছে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কাজল টেনে নেয় ঘন করে। বিনুনির মালার ফুল থেঁতলে গেছে। বিছানার বালিশে এপাশ-ওপাশ করার দরুন। ড্রেসিংটেবিলের ওপর থেকে কলাপাতার মোড়ক খুলে, আর একধা সুগন্ধ ফুলের মালা বিনুনিতে জড়িয়ে দেয়।

বড় হওয়ার কি জ্বালা! নিজের ব্যথা-বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ার

উপায় নেই কারো কাছে। আশ্চর্য জীবন! প্রকাশ হলেই লোকে যে চোখে দেখে, সে চোখে দেখবে না আর। বলবে, আমাদের চেয়ে যে সমস্ত বিবয়ে তফাৎ সাধাবণের মতন ব্যথা-বেদনা বা অস্থিরতা থাকবে না, সেই না আমাদের আদর্শ। সেই না আমাদের মাথা।

মাঝে মাঝে একলা ঘরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রুকমিনী। নিজে নিজেই বলে, লোকগুলো কেমন? বোঝে না কেন? মাথারাও রক্তমাংস মানুষেব মানুষ, তাদেবও শোকদুঃখ-সুখ—সব থাকতে পাবে।

ঠোঁটে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে ঘর থেকে বেরুবাব সময় সত্যি-সত্যিই হেসে ওঠে রুকমিনী। মানুষ এটাই চায়, আসল চায় না কেউ। হৃদয়েব কাছে পৌঁছাতে চায় না, হৃদয়কে কাছে টেনে নিতে চায় না।

উঠে পড়ল রুকমিনী। কল্পনকে বলল, শরীবটা খুব ভাল নয় আমাব। একটু বিশ্রাম কবে আসছি। মীবাকে একটু তালিম দাও তুমি ততক্ষণ।

গানেব ঘব থেকে বেবিয়ে গেল রুকমিনী তাড়াতাড়ি।

ভুল ধাবণা কবেছে রুকমিনী! যা ভেবেছিল তা নয়। কাব কাছে শিখেছিলে প্রশ্ন করতে মীবা মনে কবেছিল, সুবটা বোধ হয় গলায় বসেনি ঠিক—বেসুরো শুনে প্রশ্ন কবছে। গলাটা সেদিন ধবাধবা ছিল বলে, নিজে ঠিক গাইতে পাবছিল কিনা সন্দেহ হয়েছে।

কল্পনকে বলেছে, আমাব গান হবে তো? গলাটা কেমন বেসুবো-বেসুবো না?

না মোটেই না। সুরে বাঁধা একদম। গান হবে তো কি—গান তোমার হয়েই আছে।

আনন্দে ভরে গেলে মীরার ভেতর। বাবাও এইরকম বলত তাকে।

বছর দুয়েকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল মীরার চতুর্দিকে। যেমন গলা তেমনি গায়কি ঢঙ, তেমনি উচ্চারণ আর তেমনি ভাব। সব কটি মিলিয়ে মীরা নিজেই সুখদুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে গাঁয়ের মানুষের—গাইবার সময়। মঞ্জরী গাঁয়ের মাটি গাঁয়ের নদী গাঁয়ের ক্ষেতখামার। গাছ ফল-ফুল ঘাস-দূর্বা পর্যন্ত। ওর গানে সবই ধরা রয়েছে।

গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ মানুষ দেখে নিখুঁত গ্রামের ছবি। দেখে রক্তমাংসের চাষীদের সঙ্গে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা মিলেমিশে হাল দিচ্ছে জমিতে। সবুজ ধানের গাছে ক্ষেত ভরে গেছে। আবার সবুজে সোনালী ছোপ ধরছে। সোনালী রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে গোটা জায়গাটায়। বাতাস দুলছে, দোলাচ্ছে গাছগাছালিকে।

মীরা মীরাই। সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরে এমনটি নেই আর কেউ। হয়নি আগে, হবেও না পরে।

শ্রোতাদের মুখের কথা লুফে নিয়ে রুকমিনী বলে, সত্যিই তো! আমার এত নাম, আমিও ওর কাছে হার মেনেছি। তবে হ্যাঁ, কন্ননের অবদান কম নয়। কন্নন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। অবিশ্যি মীরার কাছে নিঃস্ব হয়ে যাওয়াটাও গৌরবের আনন্দের। আধার ভালো। আধারে বেঁচে থাকবে লোকগীতি।

মীরার প্রশংসায় কন্ননের বুকখানা ফুলে ওঠে। সার্থক মনে হয় নিজেকে। উপযুক্ত পাত্রে পড়লে, মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে সে-প্রমাণ মীরা গানের প্রথমদিনের অনুষ্ঠানেই দিয়েছে। দিনে দিনে সরস্বতীর বরকন্যা হয়ে উঠল ও।

রুকমিনীকে কন্নন বলল, সব চেয়ে আনন্দের খবরটা শুনেছো নিশ্চয়!

কতক কতক কানে এসেছে। আচ্ছা কন্নন, খবরটা কি সত্যি? তোমার কি মনে হয়? আমার তো এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। চিরদিনের শত্রু যারা—উঃ, ভাবলে ভেতরটা জ্বলে ওঠে আমার দাউ দাউ ক'রে। তোমার তো আর বাকি নেই—প্রথম থেকেই তো

তুমি আমার সঙ্গে—না থাকলে, না সাহস দিলে না সাহায্য করলে —আমি কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম আজ মুখ তুলে? আমাদের উৎখাত করাব জন্য, দেশ থেকে সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরের নামটা মুছে ফেলাব জন্য কি উঠিপড়িই না লেগেছিল ওরা।

খবর যা ছড়িয়েছে ঠিকই। এতটুকু মিথ্যে নয়। চিনুকে দু'পক্ষই ডেকে বলেছে, হ্যাঁ, রুকমিনী একটা মেয়ে বটে! অসীম ধৈর্য। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কোথা থেকে যোগাড় করল মীরাকে?

রুকমিনীর বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। তার বিদ্যামন্দির থেকে মীরাকে ছিনিয়ে নিয়ে না যায় আবার? মনের ভয় মুখে প্রকাশ করল। ওরা স্বীকৃতি দেবার নামে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে না তো মীরাকে?

সে ভয় নেই।

তুমি এত নিশ্চিন্ত কিসে? বলে বসলে ভয় নেই! ওদের অসাধ্য বলে দুনিয়ায় আছে কোন কিছু কি? কন্নন, আপনভোলা হলে চলে না। বাস্তব বড় সাংঘাতিক। ওদের আগের ব্যবহার মনে করে দেখ না।

না, না। সে আর হবে না। যাকে নিয়ে যাওয়ার ভয় তোমার, তার মত নিয়েই সাহস দিচ্ছি তোমায়।

মীরা বলেছে তোমায় যাবে না?

হ্যাঁ।

জোরে হেসে উঠল রুকমিনী।—পুরোনো প্রতিষ্ঠান। যশমান বাড়বে আরো। চারদিক থেকে মুঠো মুঠো টাকা এসেও পড়বে দু'পায়ে। এ সব লোভ ছেড়ে দেবে ও?

হ্যাঁ।

একথাও হয়েছে তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

অবাক করলে তুমি। কি স্বার্থে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে থাকবে শুনি?

তোমার জন্য আমার জন্য। তুমি এনেছো। ওর কৃতজ্ঞতা। আমি শিখিয়েছি।

ওঃ! এ-ই। কত ছাত্রছাত্রী এলো, শেখার মুখে ওরকম ছেঁদো-কথা বলল, পরে একটু নাম হতেই দে সট্‌কান। খিলখিল ক'রে হেসে উঠল রুকমিনী।

আমি বলছি তোমায়—দেখো। এ ওসব জাতের নয়। সম্পূর্ণ আলাদা। মীরা যাবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

কন্ননের দিকে চেয়ে রইল রুকমিনী। এত বিশ্বাস এলো কি ক'রে মীরার ওপর?

ইয়েত্তাপত্ত্ গীমি্চক্রম্ আর এরুবাক সঙ্গীতচক্রম।

দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি। দু'পক্ষের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দেখা হ'লে, দু'দলের লোকই মুখ ফিরিয়ে নেয়—কথা হওয়া তো দূরের কথা। বাইরের লোকের কাছে যারা অত সভ্য, তারা কেমন ক'রে অমন অসভ্য হয়ে ওঠে, সেটাই বিস্ময়ের বিষয়।

নমস্কারের ভঙ্গিমায় লোকে সৌজন্য বিনিময়টুকুও করে, এক্ষেত্রে বিপরীত। একেবারে পেছন ফিরে দাঁড়াবে।

ইয়েত্তাপুত্ত তামিলনাদের বহু পুরোনো দিনের লোকগীতি। ইয়েত্তাপুত্ত-গীতিচক্রম স্রেফ তামিলদের। এরুবাক তেলেগুদের। তামিলদের মতনই অনেক পুরোনো লোকগীতি।

মীরা দু'টি লোকগীতিতে পারদর্শিনী। তামিলদের তেলেগুদের। মীরা নিজে কিন্তু তামিল মেয়ে নয়। তেলেগু মেয়ে। ওর কোন ভাষার ওপরই বিরূপ ভাব নেই। ওর বাবারও ছিল না। বাবা বলত, মীরা! মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসবে। সে যে দেশেরই হোক, যে জাতেরই হোক। মনের ভাষাকে ভাষা বলে জানবে। ভাষা নিয়ে কোন বিদ্বেষ রাখবে না ভেতরে। তুমি সুন্দরের সাধিকা। যেখানে যখুনি যেটুকু সুন্দর পাবে, তখুনি সংগ্রহ করতে ভুলবে না দ্বিধা করবে না।

মীরা বাবাব মন পেয়েছে।

তামিলনাদে এসে, শিক্ষাদাতা কন্ননকে যা পেয়েছে, পবম সৌভাগ্য। কন্ননেব বুকখানা কত বড় ভেবেচিন্তে 'মাপজোপ খুঁজে বাব কবতে পাবে না মীবা। গল্প-উপন্যাসে পড়েছে উদাব-মহৎ মনকে সাহিত্যিকবা সমুদ্রপ্রমাণ বলে। এটা কিন্তু মীবাব মনঃপূত নয় মোটে। তাব মনে হয়, এ বিশেষণে কন্ননকে ছোট কবা হবে। সমুদ্রেবও তো শেষ আছে এক জাযগায না একজায়গায়। কন্ননেব মন এত বড, আকাশেব সঙ্গেই তুলনা কবা চলে।

কন্নন তামিল ছেলে, তা হোক সে মানুষ। কন্ননেব মধ্যে নিজেব সমস্ত আপনজনকে খুঁজে পেয়েছে মীবা। কন্ননেব মতন স্নেহ-সহানুভূতি ত্রিভুবনে খুঁজে' পাবে না। কন্নন দধীচি। তাকে বড ক'বে তোলাব জন্য কোন সভা-সমিতিতে শত অনুবোধেও গায় না। বলে, আমাবই গান গাইছে মীবা আমাব গান আমাব চেয়ে ববং ভালো ক'বেই গায।

সেখানেই যায মীবা যে পুরুষকেই দেখুক—নজবে পড়ে না সে পুরুষেব মুখচোখ। কন্ননেব প্রবো মখ দেখতে পায তাব মুখে। কন্নন মীবাব নিশ্বাসে মীবাব বক্তে মাবাব হৃৎপিণ্ডেব স্পন্দনে।

কন্ননেব চোখেব দিকে চেযে থাকে যখন মীবা, ওই আযত চোখেব তাবায নিজেব সম্পূর্ণ মুখ ভেসে ওঠে। নিজেকে ভুলে যায।

কন্ননেব ছাত্রী অলমেলু এসে বলে কন্ননকে, গান হবে না আজ ?

সচেতন হযে ওঠে কন্নন। থতমত খেযে বলে, নিশ্চয়। এখুনি হবে।

নিজেব মধ্যে ফিবে আসে মীবা। মেযেটা কি নির্দয। এতক্ষণ একটা সুখস্বপ্নেব আনন্দ বাজ্য ঘুমিযে ছিল সে, ঠেলে তুলল অলমেলু।

রুকমিনী এসে বলে, আগে সূর্য-উদয হতে না হতেই গান শুরু হ'ত—কিছুদিন দেখছি, তোমবা বড্ড দেবী কব। আমাব মনে হয, তোমবা বাত জেগে গানবাজনা কব বলে, ভোবে উঠতে পাবো না। নাই বা বাত জাগলে অত।

অলমেলু মুখ টিপে হেসেছে।

লক্ষ্য এড়ায়নি রুকমিনীর।

দু'একদিন দেখে, ইশারায় বাইরে ডেকেছে অলমেলুকে। ওপরে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। খাটে নিজের পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, বড় লোকরা যেখানে কথা কয়, সেখানে অসভ্যর মতন হাসি। কখনো যেন আর না দেখি।

বকুনি খেয়ে অলমেলু কেন হাসে জানিয়েছে। কন্নন আর মীরা দু'জনে দু'জনকে যে কি এত দেখে কে জানে! কখন অলমেলু এসেছে, কতক্ষণ ধরে ওদের দেখছে বসে বসে, কোন হুঁশ নেই ওদের। ডাকলে তখন হুঁশ আসে। গান শেখাতে শেখাতেও আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আবার ডাকতে হয়। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। অলমেলু হাসে তাই। চাপতে চেষ্টা করে। হাসি এমন ঠেলে ওঠে ভেতর থেকে যে লোকে দেখে ফেলে।

যাও, গান শেখোগে মন দিয়ে। গম্ভীর মুখে বলে রুকমিনী। এতটুকু মেয়ে—বছর সাত-আট। তার সামনে ওরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

সর্বনাশ এসে গেছে। এসে গেছে সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরের আনাচে-কানাচে অবধি। এতখানি গড়াবে ভাবতে পারেনি। রুকমিনীর ভুল হয়েছে দু'জনকে একসঙ্গে ছেড়ে দিয়ে! এ মারাত্মক ভুলের সংশোধন করবে কেমন করে?

দিশেহারা হয়ে পড়ছে রুকমিনী।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন যা অবস্থা দু'জনের একজনকে সবালে বিদ্যামন্দির ডুববে। কপালে কলংকের টিপ পড়তে হবে সকলকে। বাতাসে বদনাম ভেসে বেড়াবে। ইয়েত্তাপুত্ত আর এরুবাক—দুটি চক্রমেরই লোকেরা বিদ্রূপবান ছুঁড়ে মেরে মেরে তাকে দেশ ছাড়া করে ছাড়বে।

রুকমিনী দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল খানিক। তাই অভয় দিয়েছিল কন্নন মীরা এখান থেকে যাবে না। জোর দিয়ে বলেছিল নিশ্চিন্ত হতে তাকে।

মুখ থেকে হাত নামাল।

সামনের আয়নায় দেখল নিজেকে। আটাশে রূপ কি চলে গেছে তার? এখনো তো বান্ধবীরা বলে, মীরার দিদি মনে হলেও রূপের জৌলুষে টান পড়েনি।

খাট থেকে নামল। চুল আচড়াচ্ছে। সিঁথিটা ঠিক ক'রে নিল। ডান-নাকের নাকছাবিটা খুলে রাখল, কেমন দেখায়! ভালো দেখাচ্ছে না। মুখখানা যেন কিরকম হয়ে গেল—কিম্ভূতকিমাকার। আবার পরল। মীরার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

নিচের ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছে।

দু'জনে একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে। কল্লন আর মীরা।

রুকমিনীর বুকে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল দপ ক'রে।

এইরকম সেও কল্লনের সঙ্গে গাইত। নিজের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে আবার আগের মতন। কল্লনের ওপর অনেক আশা। বিদ্যামন্দিরের প্রধান হওয়ার উপযুক্ত একমাত্র কল্লনই। এই টোপ গিলিয়ে কল্লনকে আটকাতে হবে নিজের কাছে। কল্লনকে ছাড়লে চলবে না। ছাড়তে হবে মীরাকে। কালসাপিনীকে দুধকলা দিয়ে পুষেছে না বুঝে।

নিজের সর্বনাশ নিজে করতে ভালোবাসে বোধহয় অনেক মানুষ। রুকমিনী সেই অনেকের দলে। সর্বনাশকে আদর-অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে এনে তুলেছে। বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে মরণপণ ক'রে। কল্লনের মন থেকে চোখ থেকে সরাতে হবে মীরাকে। ওর দুনিয়ায় মীরার অস্তিত্ব থাকবে না মোটে। থাকবে একমাত্র তার।

শ্রাবণের মেঘ থমথমে আকাশ।

ররাত ভালো বৃষ্টি নামেনি। রাস্তায় বাড়িতে লোকে লোকে ছয়লাপ। উদাস বিকেলে উদাসিনী দেখাচ্ছে মীরাকে। মঞ্চের ওপর বসে। বাড়ির ভেতরে উঠোন। উঠোনে মঞ্চ তৈরী হয়েছে।

কোন গানবাজনার অনুষ্ঠানের জন্য নয়, স্রেফ মীরার জন্য।

ইয়েত্তু-পুত্তুগীতিচক্রমের বাড়ি এটা। তামিল লোকগীতির শ্রেষ্ঠশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে, সম্বর্ধনা জানানো হবে।

পাশে বসে কন্নন। রুকমিনীও মঞ্চে বসে আছে একধারে। কন্নন বলেছিল কাছাকাছি বসতে, রাজী হয়নি। মীরাও ডেকেছিল, শুনতে পায়নি যেন—এমনভাবে অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

চক্রমের প্রধান মানপত্র পাঠ করার সময় বলল, আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আমি সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরের কথা বলছি। ভেবেছিলুম, ওরা লোকগীতির নামে যা-তা চালাতে শুরু করবে। মনে-কানে সে গান সে সুর অনবরত ঘোরাফেরা করলে, আসল জিনিস চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। ঐই কারণেই ওদের এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা বাধা দিতে চেয়েছিলুম, দিয়েছিও অনেক। আমাদের ভুল স্বীকার করছি। এর জন্য আমরা খুব দুঃখিত।

প্রধান আড়চোখে তাকাল রুকমিনীর দিকে। বলল, আশা করি রুকমিনী ত নম্মা অতীতের কাদা ঘাঁটাঘাঁটি ভুলে যাবেন।

আকাশের থমথমে মেঘ রুকমিনীর মুখে নেমেছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতন অভ্যস্ত হাসি একবার মাত্র ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কন্নন মীরা হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল প্রধানকে। বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে রুকমিনীর কপালের মধ্যিখানে। অসহ্য, দু'জনের দাঁত বার ক'রে হাসির ঘটাই বা কি। শেষ হলে, বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে। আসতে চায়নি। প্রধান নিজে গিয়ে বলে এসেছে। অসুখ বলে কাটাল না কেন? এসে ঝকমারি করেছে।

'ইয়েত্তাপুত্তগীতি প্রধানম্' উপাধি দেয়া হ'ল চক্র থেকে।

মীরার সামনে মাইক এগিয়ে দেয়া হ'ল। উপাধি দেয়ার উত্তরে, সম্বর্ধনা জানানোর উত্তরে মীরা বলল, তামিললোকগীতির প্রধান বলে যে উপাধি দেয়া হল আমাকে—এটা যারা শিখিয়েছেন, তাঁদেরই প্রাপ্য, তাঁদেরই দেয়া হয়েছে। আমি শুধু নিমিত্ত। ওঁরা

প্রাণ ঢেলে না শেখালে, আমি আজ এই মঞ্চের আমি হতুম কোত্থেকে?

জোড়হাত ক'রে, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল রুকমিনীকে। বলল, নমস্কারম্‌। কল্পনের দিকে মুখ ফিরিয়ে একই কথা বলল আবার, নমস্কারম্‌।

ভেতরে বাইরে হাততালির ঢেউ উতলে উঠতে লাগল। উতলে পড়তে লাগল বেশ খানিক সময় ধরে।

মীরার মনে হ'ল, সকলের কিল চড় লাথি পড়ছে তার বুকে-পিঠে-মাথায়—সর্বাঙ্গে।

ইয়েল্লাপুত্তগীতিচক্রম্‌ থেকে একুরাক্‌ সঙ্গীতচক্রমে আর যায়নি রুকমিনী। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে বিদ্যামন্দিরে ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে। চোখের জল বাগ মানেনি। একি করল সে। নিজে খাত কেটে নিজে ডুবে মরল যে! এই সম্মান সে পেত। পেল না। মীরাকে প্রত্যেক গানের অনুষ্ঠানে এগিয়ে দিয়েছে, নিজে না এগিয়ে মীরার জয়ে রুকমিনীর পরাজয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা-ছেলের মতন কেঁদে সারা হয়েছে রুকমিনী।

একুরাক্‌ সঙ্গীতচক্রমের প্রধান ইয়েল্লাপুত্তগীতিচক্রমেরই মতো সব কিছু বলেছে ভাষণে। বয়ানের তফাৎ কেবল। এরা উপাধি দিল 'একুরাক সঙ্গীতমাল্যম্‌'।

সম্বর্ধনা আর উপাধি দেয়ার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে আগের মতনই উপাধি-সম্বর্ধনা কার প্রাপ্য, জানিয়ে দিয়েছে মীরা সকলকে? বলেছে, তেলেগু লোকগীত অসংখ্য। সব তো আয়ত্তে আনতে পারিনি আমি। খুঁটিয়ে সব আবিষ্কার করাও সম্ভব হয়নি এখনো। এর মধ্যেই তেলেগু-লোকগীতির মালা হয়ে গেলুম আমি! সত্যিই কি হ'তে পেরেছি?

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, পেরেছেন। আমাদের যতটা দিয়েছেন, তাতে একটা মালা গাঁথা হয়ে গেছে তো নিশ্চয়ই।

কি বলতে গিয়ে আর বলল না মীরা। মাইকের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিল। তার গলার স্বরও ডুবে যাবে। কারো কর্ণ-গোচর হবে না এক-বর্ণও।

রাশি রাশি ফুলের তোড়া ফুলের মালা নিয়ে কন্নন-মীরা হাসির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিদ্যামন্দিরে ফিরেছে। আশা করেছিল ওরা রুকমিনী হয়তো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দোরগোড়ায় এগিয়ে আসবে আনন্দে। কিন্তু কেউ এলো না।

ভয় ধরল মীরার। অসুস্থ বলে ফিরে এসেছে, বাড়াবাড়ি হয়নি তো কিছু? হলেও, খবর পাওয়ার উপায় নেই, যতক্ষণ না ঘরের দরজা খোলে রুকমিনী।

মীরার মুখ বিষণ্ণ। কখনও চিন্তাগ্রস্ত।

দরজা খোলার আওয়াজ হল। বেশ জোরেই। রুকমিনী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মুখ চোখ ফুলোফুলো। মীরার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল কণ্ঠস্বরে। বলল, এখন কিরকম বোধ করছেন? ডাক্তার এসেছিল কি খবর দোব?

মুচকে হেসে রুকমিনী বলল, দরকার নেই। আমি খুব ভালো আছি খুব ভালো।

ফুলের মালা ফুলের তোড়া হাতে যা ছিল, রুকমিনীর পায়ে রেখে প্রণাম করল মীরা।—আপনার জন্যই সব।

আমার জন্য নয়, কন্ননের জন্যই তোমার সমস্ত। আমি আর কি করেছি বল না? -কন্ননকে দেয়া উচিত ছিল।

দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল মীরার। কি একটা ভাবল। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। বলতে যাচ্ছিল কিছু, বলল না আর। নিজের গলার গোড়ের মালাটা খুলে কন্ননের পায়ে রাখল।

পা থেকে মালাটা তুলে নিল কন্নন। গন্ধ শুঁকে হাসতে হাসতে বলল, এটা সম্বর্দ্ধনার মালা। পায়ে স্থান নয় এর। এর স্থান যেখানে, সেখানেই থাক। মীরার গলায় পরিয়ে দিল।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল রুকমিনী। স্পর্দ্ধারও একটা সীমা

থাকে, সীমার বাইরে গেছে এরা। তার চোখের সামনে বেহায়াপনা। দু'জনের বিয়ে হয়নি, অথচ মালা দেয়াদেয়ি—লোকে দেখলে বলবে কি? আমার এখান থেকে এখুনি দু'জনে বেরিয়ে যাও! মুখ দেখতে চাই না আর তোমাদের। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। খুব সামলে নিল রুকমিনী।

অন্যায় সহ্যের যে কত যাতনা, যে ভোগ করেছে সেই জানে। কে যেন দমাদম করে হাতুড়ির ঘা মারছে রুকমিনীর বুকের ওপর। দাঁড়াতে পারল না। যাওয়ার সময় বলে গেল, শরীরটা ভালো নয় —কেউ আর ডেকো না আমায় আজ।

মীরা একটা মিলনসেতু হয়ে দাঁড়াল তামিল আর তেলেগুদের এক করবার মূলে।

দেশে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়িয়ে দিচ্ছিল এক শ্রেণীর লোকেরা। বিদ্বেষের বিষ দুদিকেই ছড়াচ্ছিল। তামিলরা স্বার্থপর, ওরা তেলেগুদের সংস্কৃতি নষ্ট করে দিয়ে নিজেরা সব বিষয়ে সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে চাইছে, তেলেগুদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আন্দোলন করতে হবে। তাদের জন্য আলাদা দেশ চাই। এর জন্য যত রকম দুঃখকষ্ট আছে, বরণ করে নেবে তারা। শত শত জীবন বলি দিতে হবে। রক্তের নদী বইয়ে দিতে হবে দেশের মাটিতে। তাদের দাবি সরকার মেনে না নিলে আগুন জ্বলে উঠবে চতুর্দিকে। সে আগুন নেভানোর সাধ্যি নেই কারো।

তামিলরাও তৈরী হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের একচুল জায়গা ছাড়বো না। ওরা কি করতে পারে দেখা যাক না। যত গর্জায় তত বর্ষায় না জানবে। ওরা দেশের শত্রু। দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে চাইছে। বিদেশীদের আধিপত্য করার সুবিধে ক'রে দিচ্ছে। এ দুশমনদের নিপাত যাওয়াই মঙ্গল!

দু'পক্ষের মাথায় খুন চেপেছে।

মীরা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে, গানের মধ্যে দিয়ে দু'পক্ষকেই শান্ত করে রেখেছে। গানের ভাষায় বুঝিয়েছে সকলকে—এক বাতাস থেকে এক নিঃশ্বাস নিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছি আমরা দু'টি সম্প্রদায়ই। এক রোদ্দুর এক নদীর জল এক মাটির ফসলে আমরা মানুষ। আমরা সবাই এক। এক দেশের এক জাতের মানুষ আমরা। একজনের রক্ত বেরুলে, সকলের রক্ত বেরুবে। একজনের মৃত্যু হলে, সকলের মৃত্যু হবে।

দু'দলই মীরার গুণমুগ্ধ। সেই সুযোগ পুরো নিতে ভোলেনি মীরা ওরা মীরার কথা শুনেছে। বলেছে, মীরা দেবী, মীরা তাদের বিবেক। মীরা দেশের আনন্দ, দেশের শান্তি।

মীরার প্রত্যেক গানের অনুষ্ঠানে কল্লন সঙ্গে গেছে। তাকে উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে, শিল্পী এই দেশের জল-হাওয়ায় মানুষ দেশের ওপর তারও একটা কর্তব্য আছে। মহা-কর্তব্য পালন করছো তুমি মীরা।

মৃদু হেসে, চোখ নামিয়ে মীরা বলেছে, আপনার মতন লোক পাশে না থাকলে আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না এসব। এটা আমার কর্তব্য নয়, এটা আমার পূজো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে কল্লন। মীরার পিঠে হাত চাপড়ে বলেছে, মীরা, তুমি শিল্পী জানতুম, কিন্তু তার চেয়েও তুমি অনেক—অনেক বড়।

ঘরে ঢুকে পড়েছে রুকমিনী। কানে কথা যেতে, মন অসুস্থ হয়ে পড়েছে আবার।

হাসি আসেনি, তবু হেসেছে। বসতে ইচ্ছে করে নি, তবু বসতে হয়েছে। ঘরের কোণে বসে আছে চিনু। চিনু লক্ষ্য করছে রুকমিনীকে। কিছুদিন ধরে বড্ড অসহায় হয়ে গেছে যেন। সব হারানোর ব্যথা পুষে পুষে পাগল না হয়ে যায় শেষে। বেশ বুড়িয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি। মুখের জেল্লা কমেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল চিনু।

চাপা গলায় কন্ননকে বলল রুকমিনী, অতি অবশ্য তুমি একবার দুপুরে দেখা ক'রো। এখন উঠি।

রুকমিনী উঠে পড়াব সঙ্গে সঙ্গে চিন্নুও উঠে পড়ল।

ঘরে এলো।—আমার একটা কথা শুনবে তুমি?

চিন্নুর দিকে মুখ ফেরাল রুকমিনী।—অন্য সময় এসো। এখন বিরক্ত করো না।

দরকারি কথা ছিল। এক মিনিটের মধ্যে চলে যাচ্ছি।

খাটে বসল রুকমিনী, চেয়ারে চিন্নু।

চিন্নু বলল, তোমার সমস্ত অশান্তির কাবণ আমি জানি। ভেবে শরীর খারাপ করে কোন লাভ নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। কন্নন-মীরার বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। আমি তার উপায় খুঁজে পেয়েছি।

অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল রুকমিনী, কি উপায়?

কুটিল হাসি নেচে উঠল চিন্নুর দু'চোখে।—তেলেগু-তামিলের ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতে হবে ওদেব দু'জনের ভেতর। কন্নন তামিল, মীরা তেলেগু। তেলেগু মেয়ে কন্ননের বুকে ছোরা বসাবেই। তামিলদের ঘেন্না করে, বিশ্বাসঘাতক ভাবে ওরা। নিজেদের কাজ গোছানোর জন্য ওরা পায়ের কুকুর, তারপর মাথার মুগুর। কন্ননের মাথায় ঢুকিয়ে দোব আমি।

নিবিড় অন্ধকারে আলোর বিন্দু একটা দেখতে পেল রুকমিনী। বিন্দু—হারিয়ে যেতে কতক্ষণ। সংশয়ের দোলায় রুকমিনীর মন দুলে উঠল। বলল, কন্ননের মাথায় ঢুকবে কি? ঢুকলেও মীরা কি বোঝাবে কে জানে।

যাই বোঝাক, এ জাতের ব্যাপার, জাতের ব্যাপার। এখানে মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠতে বাধ্য। ইতিহাসে অনেক নাজর মিলবে। বিয়ে করা স্ত্রীকে ছেড়েছে সৈন্যরা শত্রু দেশের মেয়ে হয়ে পড়লে।

মনে মনে বলল রুকমিনী, ভিতটা শক্ত মনে হচ্ছে। মুখে বলল, তুমি তো জানো, আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন কন্ননকে। ও যাতে না ভেসে যায়—যা ভালো বিবেচনা কর—ক'রো।

মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেছে চিনু। রুকমিনী সদয় হ'লে তার আশা পূর্ণ হবে। কন্ননের বদলে তাকেই বিদ্যামন্দিরের প্রধান ক'রে দেবে। আর ভবিষ্যতে? ভবিষ্যতে রুকমিনীর হৃদয়ের প্রধান —হৃদয়েশ্বর হয়ে উঠবে সে!

সঙ্গীতসাধনা কার চিনু। সেই সঙ্গে রুকমিনীকে পাওয়ার সাধনাও করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রতি পদে পদে ব্যর্থ হয়ে গেছে! তাকে দেখলেই রুকমিনী খিটখিটে হয়ে ওঠে। কটমট করে তাকায়। সব-টাতে চিনুর দোষ, চিনু অপরাধী। চিনুর নাম নেই মুখে একবারও, কেবল, কন্নন-কন্নন। প্রতিষ্ঠানের জন্য রুকমিনীর জন্য জীবনপাত করে চলেছে চিনু—সাক্ষাতে—গোপনে। রুকমিনীর দৃষ্টি নেই একদম।

কন্ননকে নিয়ে, মীরাকে নিয়ে পাষাণীর বুকে চিড় খেতে শুরু করেছে এবার। ওই চিড়ের ভেতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করবে চিনু। করবে আধিপত্য বিস্তার। প্রতিষ্ঠান তার রুকমিনী তার। কন্নন পর মীরা পর।

দুপুরে এসেছে কন্নন।

মেঝের নীল কার্পেটের ওপর বসেছে। সামনে এসে বসেছে রুকমিনীও। কন্নন মেঝেয় বসলে রুকমিনীও মেঝেয় বসে। অন্যদের বেলায় যেমন খাটে বসে থাকে, এর বেলায় পারে না। কেমন বাধোবাধো ঠেকে। নিজের কাছে কন্ননকে বড় মনে হয়। তাছাড়া নিজের চেয়ে কন্ননকে বড় ভাবতে ভালোলাগে রুকমিনীর। কত লোকই না বিয়ে করতে চেয়েছিল রুকমিনীকে। কন্ননের মতন কাউকে পায়নি। এক একটা বিয়ে নাকচ করেছে,—এক একটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে। কন্নন শিক্ষক, সে প্রধান—বিয়ে হয় কেমন করে? কন্ননকে প্রধান করার পর—ওর ঘরণী হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সমস্ত ভেস্তে যেতে বসেছে মীরার জন্য।

চুপ ক'রে বসে আছে রুকমিনী।

কন্ননই প্রথম কথা কইল।—ডেকেছো কেন?

একটু চমকে উঠেই নিজেকে সংযত করে নিল রুকমিনী। বলল, আমি আর এসব দেখাশোনা করতে পারছি না। ভালোও লাগছে না। তোমাকে প্রধান করে দিয়ে অবসর নিতে চাই।

কন্ননের কথায় বিস্ময় ঝরে পড়ল—এর মধ্যেই অবসর? তোমায় অবসর নিতে দিচ্ছে কে শুনি?

এখন না হলেও, দু'দিন বাদে তো এ ভার নিতে হবে তোমায়।

তখনকার কথা তখন। উঠি। বলল, মীরাকে নিয়ে বেরুতে হবে আবার এখুনি।

কোথায়?

এরুবাকসঙ্গীতচক্রমে মিটিং আছে। 'তেলেগু-তামিল ভাই ভাই'।

মুহূর্তে রুকমিনীর পোশাকী ভদ্রতা খসে পড়ে গেল। সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। চীৎকার ক'রে বলল, মীরা-মীরা! সদাসর্বদা মীরাকে নিয়ে যদি টো-টো ক'রে এখানে-ওখানে ঘোরো, লোকে কি ভাববে? ও কুমারী—সে খেয়াল আছে?

খেয়াল আছে। লোকের কথা কানে যায়।

সব জেনেও! এত নিচে নামলে কি ক'রে?

নিচুতে নয়, উঁচুতেই উঠেছি। আমার জন্য ওর অপযশ জানি আমি। জানি বলেই স্ত্রীর মর্যাদা দোব ওকে। দেখি, কার ঘাড়ে কত শক্তি—আমাকে নিয়ে ওকে নিয়ে যা-তা বলুক।

রুকমিনী কোথায় আছে? কি শুনছে—কার মুখে শুনছে? এর চেয়ে মাথায় বাজ পড়ল না কেন এখুনি? কন্ননের স্ত্রীর মর্যাদা পাবে মীরা!

ক্ষেপে উঠল রুকমিনী।—মনে আছে ও তেলেগু মেয়ে?

আছে।

লজ্জা করবে না ওকে বিয়ে করতে? যারা আমাদের স্বজাতি

নয়, আমাদের ঘেন্না করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে—তাদের মেয়েকে! একেবারে গোল্লায় গেছে দেখছি। দেশেতে কিরকম আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে ওরা—সেটাও ভাবো না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ'! ভালো চাও তো ও-প্রস্তাব ত্যাগ কর কন্নন।

মীরাকে আমি এখানে রাখবো না আর।

তুমি কি এটা ঠিকই ক'রে ফেলেছো?

হ্যাঁ।

তাহ'লে বিদ্যামন্দিরের প্রধান হওয়ার আশা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হবে তোমাকে। ভেবে দ্যাখো।

প্রধান হ'তে চাই না আমি।

—রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে গান গেয়ে গেয়ে—সেদিন মনে নেই। এই রুকমিনী ঘরে তুলে এনেছিল, মনে নেই। কার জন্য লোক চিনল কন্ননকে? মনে নেই বেইমান-নিমকহারাম। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে।

চৌকাঠের ওপারে পা বাড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল কন্নন, তোমাব শরীর খারাপ, বিশ্রাম নাও।

চলে গেল কন্নন।

কান্নার বন্যা ছুটল রুকমিনীর দু'চোখে। আছড়ে পড়ল বিছানায়। একি বলে বসল? মাথাটা কেন এমন হয়ে গেল? কন্নন বড্ড অভিমানী। দিনরাত গান নিয়ে থাকত বলে, বড় ভাই বলেছিল, দিনরাত গান আর গান। কান ঝালাপালা। বাবার অন্ন ধ্বংস করছে বসে বসে। লজ্জাও করে না গান গাইতে। অত বড় ছেলে, পয়সা রোজগারের কোন ফিকিরই নেই। বাবার যেমন আস্কারা দেয়া। আমি হ'লে, বাড়ি থেকে বার ক'রে দিতুম। কুঁড়ের মরণ! অমন ছেলে ভিক্ষে মেগে যাক গে! কত ধানে কত চাল বুঝুক।

সহরে এসে ভিক্ষে মেগেই খেয়েছে কন্নন। তবু ভায়ের কথায় সেই যে বেরিয়ে এসেছে—আর ফেরে নি। রুকমিনী যেতে বলেছে অনেকবার। যেতে চায় নি কন্নন।

সেই কল্লনকে বেরিয়ে যেতে বলল রুকমিনী ওর প্রকৃতি জেনেও। কি তুর্গ্রহ মাথায় ভর করল তার। কল্লন আসবে না আর ফিরবে না আর। আটকাতে গিয়ে নিজেই বার ক'রে দিল। নিজের বুদ্ধির দোষে বিয়েটা এগিয়ে দিল।

নিজের কপাল নিজে চাপড়াচ্ছে রুকমিনী। দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছল, চিন্নু ঢুকল ঘরে। কল্লনকে অনুসরণ ক'রে এসেছিল। আড়াল থেকে শুনেছে সব। বলল, স্থির হও রুকমিনী! অত কান্নাকাটি করলে চলবে না, অত অস্থির হলে চলবে না।

চিন্নুর ডাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে রুকমনী। কথা শুনে এতটুকু হয়ে গেছে। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছে। রুকমিনী কত তুর্বল —চিন্নু স্বচক্ষে দেখল, বুঝে ফেলল ভালো ক'রে।

চিন্নু বলল, বিয়ে ভাঙাব প্রাণপণ চেষ্টা করবো আমি।

রুকমিনীর দৃষ্টিতে সন্দেহ অবিশ্বাস। চেয়ে চেয়ে দেখছে। এ কল্লন নয়। কল্লনের মতন না আছে জিদ না আছে ব্যক্তিত্ব না আছে গুণ। বহুদিন ধরে তার পেছু লেগে আছে। ওর মতলব জেনেও রুকমিনী তাড়ায়নি ওকে। নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে চললে, কারো কোন ক্ষমতা নেই একগাছা চুল স্পর্শ করার। একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা কাজের জন্য নানা লোককে দরকার। কত বাছবে? ঠগ বাছতে গাঁও উজাড় হয়ে যাবে'

এক তো কল্লনের সঙ্গে তুর্ব্যবহারের জন্য অনুশোচনার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ভেতর, তার ওপর ভয়ানক সমস্যা এসে হাজির হল। চিন্নু। এতদিনের আবরণ চিন্নুর চোখ থেকে সরে গেছে। তার তুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে আসতে না চেষ্টা করে।

চিন্নু বেরিয়ে যাওয়ার সময় আবার অভয় দিয়ে গেল রুকমিনীকে। —একটা ব্যবস্থা ক'রে, তবে তোমার কাছে মুখ দেখাবো, নচেৎ নয়।

তুঃখের ওপরেও হেসে ফেলল রুকমিনী। চিন্নু ঢোঁরা, কেউটে নয়। বিষ নেই ফুলপানা চক্র।

সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরেব ত্রিসীমানায় আসে নি কল্লন প্রায় দিন পনেরো হল। মীরাও আসে না। মীরা না আসুক—দুঃখ নেই রুকমিনীর। কিন্তু কল্লন না এলে, বিদ্যামন্দির বন্ধ হয়ে যাবে যে শেষ পর্যন্ত। এখুনি তো ছাত্রছাত্রীরা বলতে শুরু করেছে—কল্লন গুরুদেব যদি এ বিদ্যামন্দির ছেড়ে দেয়, তারাও ছাড়বে। গুরুদেরের জন্যই এখানে আসা।

এমন অকূলপাথারে পড়েছে রুকমিনী, পরে হবে কি করে কে জানে? দিশেহারা পথহারা অবলম্বনহীন। এ বিপদের কাণ্ডারী কে তার? কেউ নেই নিজেকেই বুক বেঁধে নিজের কাণ্ডাবী হতে হবে।

হাতী যখন দঁকে পড়ে, চামচিকিরও পায়ে ধরে। চিনুকে বলল রুকমিনী, মুখে তো ব্যবস্থা কবছি বললে, কাজে হল কই?' কথায় হাম বড়-খালি।

আমতা আমতা করে চিনু বললে, হাম বড ভাব অপরকে দেখালেও তোমাব কাছে দেখাই না। তুমি কষ্ট পাবে বলে বলেনি।

কি এমন ব্যাপার যে কষ্ট পাবে? মীবার মৃত্যু খবর কি?

না তার চেয়েও বাড়া।

যা বলার স্পষ্ট করে বল! অত ভনিতা-ভূমিকা ভালো লাগছে না আমার।

তবে শোন! আমাকে কিন্তু কোন দোষ দিও না।

দ্যাখো চিনু, তোমার এই রকমের জন্য পিত্তি জ্বলে যায় আমার। যা বলবে, চটপট বলে ফেল।

কল্লন আসবে না। মীরাকে বিয়ে করে ঘব বেঁধেছে সে।

বজ্রপাত হল যেন ঘরে। নিস্পন্দের মতন রুকমিনী দাঁড়িয়ে রইল খানিক তারপর সচেতন হয়ে চিৎকার করে বলল, তোমরা সকলে মিলে আমাব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, এ কাজ কবেছো নইলে কল্লন বিয়ে করত না।

মনে মনে খুশী চিনু। চিনুর কাঁটা কল্লন সরে গেছে। চিনুকে এখন পায় কে।

চিনু খবর পেয়েছিল, মীরা-কন্নন তামিলনাদ ছেড়ে চলে গেছে। গেছে মীরার কাকার কাছে—মঞ্জরী গাঁয়ে।

চিনু যায়নি যে তা নয়, গেছে। মীরাকে বলেছে বুঝে-সুঝে পা বাড়াও চতুর্দিকে তুঁষের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। আলাদা অন্ধ্রপ্রদেশের দাবিতে বিরাট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সকলে। ঘরে বাইরে। এমন এমন অবস্থাতে বিপদকে বরণ করে ঘবে নিয়ে আসতে চায় নাকি কেউ? তুমি তো আর আহাম্মুক নও যে, কন্ননের ফাঁদে পা দেবে। যাই হোক সাবধান হয়ে থেকো। তোমাদেব দু'জনের জীবন নিয়ে টানাটানি হয় শেষে। সেই ভয়।

মীরা বলেছে, এখন আর পেছনো যায় না। আমি পেছতে চাইলেও কন্নন পেছবে না কিছুতেই। আমি বলেছিলুম, আমার জন্য শেষে একটা মহাপ্রাণ—

মুখেব কথা কেড়ে নিযে বলেছে, কন্নন, মিথ্যে ধাবণা তোমার। আমবা দু'টো দলকে এক কবতে চেষ্টা করছি। তোমাতে আমাতে বিয়ে হ'লে—সেইটাই প্রমাণ হয়ে যাবে আবো সকলেব কাছে। আমাদের ওপব আস্থা বিশ্বাস আসবে লোকের। .

এই হ'ল কন্ননের বক্তব্য। হেসে বলেছে মীরা।

চিনুর দিক থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়নি। যা আশা করেছিল হ'তে চলেছে তাই। বাজিয়ে পরখ ক'বে নিল মীরাকে। বিয়েটা ঠুনকো কথার ওপর দাঁড়িয়ে নেই। পাকা ভিতের গাঁথনি। বিয়ে হয়ে গেলে, বরাবরের মতন দু'জনেবই বিদ্যামন্দিবে প্রবেশ নিষেধ। রুকমিনী পাষাণী হয়ে উঠবে ওদের ওপব।

যা চেয়েছিল চিনু, তাই হয়েছে।

মীরা-কন্ননের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করছে ওরা। বিদ্যামন্দিরের ধাবে কাছে আসে না কেউ।

চিনুকে ডেকে বলল রুকমিনী, হাতে গড়া জিনিসটা এইভাবে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে। কি করে রক্ষে হয়—একটু চিন্তাটিন্তা কর। তুমিই আমাব একমাত্র ভরসা।

চিনু খুশী। রুকমিনীর মনে ঠাঁই হয়েছে তার। দাঁড়িয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়।

ছাখো, কন্ননটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবারটির জন্য নিয়ে আসতে পারো তুমি।

মাথা চুলকে বলল চিনু, কারণ জানতে পারি ?

নিশ্চয়-নিশ্চয়। তুমি আমার আপনজন। তুমি না জিজ্ঞেস করলেও, কারণ তোমায় শোনাতুমই। লোকগীতির কতকগুলো পুরোনো পাণ্ডুলিপি রয়েছে ওর কাছে। বাছাধনের সেই গরবেই যত গরবী। নেচেকুঁদে চতুর্দিকে বেড়াচ্ছে এত ওইটার জন্যই। নাম কিনছে, যশ কুড়োচ্ছে। আমার সম্পদ বিদ্যামন্দিরের সম্পদ তোমার সম্পদ। আদায় করতে হবে। পাণ্ডুলিপি পেলে, আমি গান শেখানো শুরু করবো। দেখবে, হুমড়ি খেয়ে পড়বে ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যামন্দিরে জায়গা দিতে পারবে না তখন। এ পাণ্ডুলিপি আমার হক-পাওনা। দেশে দেশে ঘুরে সংগ্রহ করেছি। কত কষ্ট ভোগ করেছি। জলে ভিজেছি, রোদে পুড়েছি।

ও কি দেবে ?

তা আবার কেউ কখনো নিজে হ'তে দেয় নাকি ? তোমায় ফন্দি আটতে হবে—ঘুণাক্ষরে, জানতে পারলে—দেশ ছেড়ে হাওয়া হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। হাওয়া হোক, দুঃখ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য জিনিসটা হাতিয়ে নেয়া। পারবে না ?

কিন্তু ও কি তোমার কাছে আসতে চাইবে ?

বেশ, আমার নাম ক'রো না। 'তেলেগু-তামিল ভাই ভাই'য়ের সভায় গান গাইতে হবে বলে নিয়ে আসবে। এখানে নয়, নন্দন গাঁয়ে নিয়ে যাবে। পোড়ো জায়গা, লোকবসতি নেই বললেই চলে, অনেক পোড়ো কুঁড়ে ঘর পড়ে রয়েছে। নিয়ে গিয়ে আটকাবে একটাতে। যতক্ষণ না দেয় পাণ্ডুলিপি, ছাড়বে না। চারজন জোয়ান ব্যবস্থা ক'রে দোব পাহারার জন্য। পালাতে যেন না পারে কোনদিক দিয়ে।

এ মতলবটা মনে লেগেছে চিনুর। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল, নিশ্চয় পারবো।

ঘন ঘন মীরাদের বাড়ি আসতে শুরু করেছে চিনু। কল্পনের জন্য মন অস্থির হয়ে ওঠে থেকে থেকে। হয়তো পূর্বজন্মে সহোদর ভাই ছিল দু'জনে। অতদিন একসঙ্গে থেকেছেও তো বিদ্যামন্দিরে। একজনের সুখে অন্যজন সুখী হয়েছে, একজনের দুঃখে অন্যজন দুঃখী হয়েছে। এ সম্পর্ক কি ম'লেও ছাড়া যায়?

কথা শুনে, মীরার চোখের কোণ চিকচিক ক'রে উঠেছে। বলেছে, চিনুভাই, তোমাকে দেখলে, তুমি এলে, মনে হয় -বিদ্যামন্দিরেই আছি আমি। রুকমিনী আম্মা দেবী। দেয়ালে টাঙানো রুকমিনীর ছবির দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ায় মীরা। প্রণাম জানায় মনে মনে।

বলে, ওখানে আমার স্বর্গরাজ্য ছিল।

ছবির তলায় পেতলের তিন পায়া একটা ধূপদান বসানো রয়েছে। পাঁচ ছটা ধূপ গোঁজা—চন্দন ধূপ।

চোখ বুজে বসে থাকে মীরা কিছুক্ষণ। বুক ভরে সুগন্ধ টেনে নেয়। গুন গুন ক'রে স্তব ভাঁজে। কল্পনও প্রণাম জানায় রুকমিনীর ছবির উদ্দেশে। হাতজোড় ক'রে বলে, চিনু, রুকমিনী না থাকলে এ কল্পনকে পেতে না ভাই। আমার সব কিছু ওর দয়ায়।

যাবে একদিন? সাহসে ভর ক'রে বলে চিনু।

চনমন ক'রে তাকায় কল্পন। ছলছল করে ওঠে দু'চোখ। বলে এখন না।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় চিনু।—কিন্তু তোমাকে একদিন এক জায়গায় যেতেই হবে। আমি কথা দিয়েছি তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে। তার আগে তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখেশুনে এসো না। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসবে। তোমার ভালোলাগবে খুব। আমি জানি, শুনলে, তুমি রাজী হবেই।

'তেলেগু-তামিল ভাই ভাই'য়ের ওরা ভক্ত খুব। ওরা সভা করবে একটা। কোথায় ?

কোথায়—এখন বলবো না। নিয়ে যাচ্ছি তো আমি।

কন্নন কথা দিল, যাবে। সামনের সপ্তায় শনিবারে বিকেলে।

চিন্নুর ফাঁদে পা দিয়ে সরলপ্রাণ কন্নন বন্দী হ'ল। নন্দনগাঁয়ের পোড়ো ঘরে।

পাণ্ডুলিপির দাবি শুনে, হতভম্ব, হতবাকও কিছুক্ষণ !

একটু আগের মিষ্টিমধুর মানুষ চিন্নুর ভয়ংকর হয়ে উঠতে দেরী লাগল না। কর্কশ-বিকৃত গলা। বলল, অমন বোকা সাজা লোক ঢের দেখেছি। ন্যাকামি চলবে না আমার সঙ্গে। তাতে সহজে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না। পাণ্ডুলিপি না দিলে, তোমাব মুক্তি নেই। কোথায় আছে বল !

চারজন যণ্ডামার্কা জোয়ানদের দেখিয়ে বলল, পালানোর চেষ্টা করো না। পারবে না। কোথায় আছে—চিঠি লিখে দাও !

আমার ঘরদোর বাক্সপেঁটরা তল্লাশ করে দেখে আসতে পারো যে কোন গানের পাণ্ডুলিপি বিদ্যামন্দিরের আলমারীতে সাজানো রয়েছে। তোমাদের সকলের সামনে দিয়েই, মীরা আমি খালি হাতে বেরিয়ে এসেছি।

ঠিক আছে পচে পচে মর এখানে। রুকমিনীর হুকুম—এক হাতে পাণ্ডুলিপি এক হাতে তোমার মুক্তি। ভেবে দ্যাখো।

ঘরে তালাবন্ধ ক'রে চলে গেছে চিন্নু।

জানলার কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে কন্নন। আকাশ নয়। চিন্নুকে। জংলাগাছের পাশ দিয়ে মানুষডোবা ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল চিন্নু। দেখতে পাওয়া গেল না আর।

মীরার কাঁদো কাঁদো মুখ ভেসে উঠছে কন্ননের চোখের সামনে। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবো বলে এসেছে কন্নন। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নেমেছে। ফিরতে পারল না। কবে ফিরবে—কখন ফিরবে—তাও জানে না।

মীবা একদণ্ড চোখেব আড়াল কবতে চাইত না তাকে। যত দেবী হবে, তত উতলা হবে। কেঁদেকেটে সাবা হয়ে যাবে। কেউ বোঝানোব নেই ওকে, কেউ দেখাব নেই ওকে।

বাইবে ঘুটঘুটে অন্ধকাব।

কচিছেলেব কান্নাব মতন শকুনিব বাচ্চাব কান্না শুনতে পাচ্ছে কন্নন।

ঘুণধবা কাঠেব বেলিংয়ে হাত দিয়ে দেখল, অসুবিধে হবে না ভাঙতে। এই বাতেব অন্ধকাবে গাঢাকা দিযে পালাতে হবে তাকে। গুণ্ডাবা দবজাব সামনে বসে মদ গিলছে। উগ্র গন্ধ পাচ্ছে। কে কতখানি খেযেছে, আবো কতখানি কাব প্রাপ্য এখনো, হিসেবনিকেশ চলছে এই নিযে। নেশা ধবেছে ওদেব। কথা জড়ানো-জড়ানো। আব একটু দেবী কবলে, মাটি নেবে ওবা। তখন কন্ননেব মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

ঘবেব ভেতব পায়চাবি কবছে কন্নন। সুযোগেব অপেক্ষা। কিন্তু এ অপেক্ষাব কি শেষ নেই? ওবা যে এখনো ফিসফিস কবে কথা কইছে নিজেদেব মধ্যে। ঘবেব চাবপাশে টহল দিযে যাচ্ছে পালা ক'বে এক একজন। ওদেব চোখে ঘুম আসছে না। ঘুমিযে পড়ছে না কেউ।

ভেতবে থাকতে পাবছে না আব কন্নন। এখান থেকেই মীবা কি কবছে, দেখতে পাচ্ছে। মীবা আছাড়িপাছাড়ি কবছে বিছানায। ছুটোছুটি কবছে চতুর্দিকে। খোঁজাখুঁজিব অন্ত নেই। দবজায-দবজায বিমুখ হযে ফিবছে কেবল। তিরুমাঙ্গল্যম হাবানোব মতন অবস্থা ওব। মনে পড়ে কন্ননেব একদিন মীবা তিরুমাঙ্গল্যম হাবিযে ফেলে কি কান্নাই না কেঁদেছিল। বিযেব মঙ্গল সূত্র এই তিরুমাঙ্গল্যম্। ওব কান্না দেখে নতুন একটা পবিয়ে দিযে কন্নন বলেছিল, আমি তো আমি আমাব আত্মাও বাঁধা থাকবে তোমাব কাছে চিবদিন। হাত ঠাণ্ডা হযে এসেছে। সমস্ত দেহটা থবথব করে কাঁপছে ওব। মীবাব চোখেব জল হাতে পড়ল না? . না,

জানালায় একটা জোয়ানের বীভৎস মুখ। থুতু ছুঁড়ে ফেলেছে গায়ে। একি রকম ভদ্রতা! জানালার দিকে এগোতে যাবে, লাঠি গলিয়ে কন্ননকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জোয়ান।

দিনসাতেক হয়ে গেল।

কন্ননের কোন পাত্তা মিলল না। রুকমিনীব কাছে ধন্না দিয়ে দিয়ে হায়রান হয়ে গেছে মীরা। রুকমিনীর সতেজ গলায় পরিষ্কার উত্তর। আমি পছন্দ করি না রোজ এসে ঘ্যানর-ঘ্যানর কর তুমি। তোমরা চলে যাওয়ার পর—সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। কন্ননের খবরাখবর আমি জানবো কেমন করে।

চিন্নুকে কেঁদে বলেছে মীরা, তুমি তো নিয়ে গেলে ভাই!

নিয়ে গিয়েছি বলে কি চোরেরদায়ে ধবা পড়েছি? চোটপাট জবাব চিন্নুর। খানিকটা রাস্তা এসেই তো বাড়ি ফিরে গেল। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে তবে যাবে। আমায় বিরক্ত করতে এসেছো কেন? যেখানে-যেখানে যায়—আর পাঁচ জায়গায় গিয়ে খোঁজ নাও।

উপায়ান্তর না দেখে পুলিশের দরবারে গেছে মীরা। মীরার সব কথা শুনে চিন্নুকে পুলিশে ধরেছে। ধরেছে মীরার কথার ওপর নির্ভর করে। ওই বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছল কন্ননকে।

হাজতবন্দী হয়ে রয়েছে চিন্নু। ওখানেও ওর একই কথা। —কিচ্ছু জানে না—কোথায়। বাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে গেসল।

কোথায় গেছে জানে রুকমিনী, কিন্তু না জানার ভান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল। কন্নন কোথায় গেল, কন্নন কোথায় গেল। চিন্নুকে দিয়ে নিয়ে এসে গোপনে আটকে রাখবে ভেবেছিল। সেখানে নিজে গিয়ে ওর মনটাকে ঘোরাবে। মীরাকে চোখের বাইরে রেখে, কন্ননের মনেরও বাইরে রেখে দেবে।

সব আশার জলাঞ্জলি হয়ে গেছে রুকমিনীর. রুকমিনী ফিরে

পেল না, পাবে না। পাণ্ডুলিপি চুরির মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়েছে। স্রেফ কল্লনকে কাছে পাওয়ার জন্য। রুকমিনীর জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে কল্লন পালিয়ে গেল। কেঁদে বুক ভাসিয়েছে রুকমিনী।

চিন্নু আর চিন্নুর দল হাজত থেকে ছাড়া পেল দিনকতক পর। জামিনে খালাস নয়। বেকসুর খালাস।

মীরা নিজে গিয়ে বলেছে থানায়, কল্লনের হদিশ পেয়েছি আমি। ভালো আছে। মিছিমিছি ভদ্রলোকের ছেলেদের কষ্ট দেয়া হল। আমি খুব দুঃখিত। ওদের দুর্ভোগ যা হ'ল, ক্ষমা চেয়েও পূরণ করা যাবে না।

মুক্তি পাওয়ার পর চিন্নু অনেক খুঁজেছে মীরাকে। পায়নি। কোন্ নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে মীরা কে জানে।

খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে গেছে, তবু একটা নেশা প্রেরণা যুগিয়ে যায়। মীরাকে একটি বারের জন্য দেখার।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর খুঁজে চলেছে চিন্নু মীরাকে। মৃত্যু না হওয়া অবাধ এ খোঁজার তার শেষ হবে না বুঝি। আপসোস-অনুতাপ পাগল ক'রে তোলে তাকে সময় সময়। তার জন্য, তাদের জন্য মীরা দেশছাড়া হয়ে গেল।

মঞ্জীর গাঁয়ে মীরার কাকার কাছে দৌড়ে গেছে। ওখানে এসেছে কিনা। বৃথাই যাওয়া। আসেনি।

দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেছে।

আশার প্রদীপ ধিকি ধিকি জ্বলে নিভুনিভু হয়ে এসেছিল। হঠাৎ জোরে জ্বলে উঠল। প্রদীপ নেভার সময়ের মতন নয়। প্রদীপ জ্বলে থাকার মতন।

রঙ্গন বন্ধু। কলকাতায় থাকে। টেলিগ্রাম ক'রে আনিয়েছে। তামিলনাদ সঙ্গীত সম্মেলনে মীরা গান গাইতে আসছে।

এসেছে চিন্নু।

এমন ভিড় জীবনে দেখেনি। লোক থিক-থিক করছে। রাস্তায় ফুটপাথে মণ্ডপে। মণ্ডপের ওপর হাসিমুখে মীরা বসে, পাশে কল্লন। একা দেখছে না। ছু'একজন চেনে যারা তারাও দেখছে কল্লনকে।

কিন্তু এ কেমন ক'রে হয়! চিন্নু সব জানে। কল্লন যেখানে গেছে, সেখান থেকে আর কোনদিন ফিরতে পারে না। এ ছুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে সে।

যে রাতে নন্দন গাঁয়ের পোড়ো ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখে এলো চিন্নু, সেই রাতে গুণ্ডারা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে, জানালা ভেঙে পালাতে চেষ্টা করেছিল কল্লন। ধরা পড়ে যায়। গুণ্ডারা সজাগ-সতর্ক ছিল। ওরা মদ খায় কিন্তু মদ ওদের খেতে পারে না। নেশা আসে না।

ধরাপড়ার পরও অনেক ধস্তাধস্তি করেছে পালানোর জন্য। চারজনের সঙ্গে একা পারবে কেন? যত চেষ্টা করেছে তত পিটিয়েছে ওরা। আটকাতে বলা হয়েছিল বলে থেঁতলানো দেহটাকে আটকে রেখেছিল ওরা। কল্লনের প্রাণকে আটকে রাখতে পারেনি।

মীরা জানতে পেরেছিল কল্লন বেঁচে নেই। একথা শুনেছে চিন্নু মীরার কাকার মুখে। কল্লন নেই জেনেও গলা থেকে 'তিরুমঙ্গল্যম' খোলেনি মীরা। কাকাকে বলেছিল, ঠাট্টা ক'রে বললেও—আমার কাছে সেটা সত্যি। বলেছিল, তিরুমঙ্গল্যমে—আমি কেন—আমার আত্মাও বাঁধা হয়ে আছে তোমার কাছে।

বৃষ্টি শুরু হল।

চিন্নুর ছু'চোখে জল। গান শেষ হয়েছে। হাততালির শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে জায়গাটা। মঞ্চ থেকে নামার পালা মীরার। নামছে, পাশে পাশে কল্লন।

অনেক আশা ছিল মীরার কাছে ক্ষমা চাইবে দেখা হ'লে। বলবে, এমন হোক—কল্লন চলে যাক—মনে—প্রাণে চায়নি সে। কেন মুক্তি দিয়ে এলো মীরা তাকে? কল্লন চলে যাওয়ার জন্য দায়ী চিন্নুই।

ক্ষমা চাওয়া হ'ল না চিন্নুর। ক্ষমারও অযোগ্য সে। ভিড় ঠেলে এগোতে পারল না একপা-ও। দেয়ালে চেপ্টে গেছে।

গাড়িতে উঠে বসেছে মীরা। ভড় কেটে কেটে চলছে গাড়ি।

নিওনলাইটের আলো পড়েছে মীরার গলায়। তিরুমঙ্গল্যমের সোনার পাতে জ্বলজ্বল করছে কল্লনের মুখখানা। যেন সূর্যের ছটা।

চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চিন্নুর।